বোফর্স কামান জার্মান সাবমেরিন ও সুইজারল্যাণ্ড

মুরারি ঘোষ



দিলীপ চক্রবর্তী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, ১৯৮৮

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবিকাশ হাজরা
বিষ্ণু প্রিণ্টিং হাউস
৩৮/১এ, হরিতকী বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি কীভাবে জড়িয়ে থাকে তার বিচিত্র প্রকাশ ইদানিং দেখা যাচ্ছে। সারা বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক জগতে অর্থনৈতিক অপরাধের প্রাবল্য ক্রমশই বর্ধমান। রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরাও অর্থনৈতিক দুর্নীতির আড়ালে জড়িয়ে থাকেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র কেমনভাবে অর্থনৈতিক দুর্নীতিকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে দেশে দেশে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমাদের দেশেও এখন তা দুর্লক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন অজস্র ঘটনা ঘটেছে—নানা দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা অভিযুক্ত হয়েছেন, তাদের গোপন অর্থনৈতিক অপরাধ প্রকাশ পেয়েছে, বহুক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়নি বা ওঠামাত্রই চাপা পড়ে গেছে। অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি বলেই অপরাধ সংঘটিত হয়নি—এমন নয়।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থনৈতিক অপরাধগুলি এখন কেবল এক একটি দেশের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের খেলা চলছে। বিশ্বজুড়ে নানা দেশে গড়ে উঠেছে কালো টাকার গোপন আশ্রয়স্থল—সাদা বাংলায় যাদের বলা হয় 'ট্যাক্স হ্যাভেন'। কালো টাকা, ট্যাক্স হ্যাভেন, নাম্বারড একাউন্ট, সুইস ব্যাংক—এই সব কথাগুলি এখন আমাদের প্রায় প্রতিদিনের আলোচনায় আসছে। সংবাদপত্রেও থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক দুনিয়ার কারবারিরা ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত না হলে অন্ধকার জগতের শব্দগুলি আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোত হয়ে যেত না।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সেইসব কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য।

মুরারি ঘোষ
দিলীপ চক্রবর্তী

বিষয়-সূচী

কথামুখ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বচ্চন ভাইদের (অমিতাভ ও অজিতাভ) চারিত্রিক প্রশংসাপত্র কেবল বোফর্স কোম্পানি থেকে পাওয়া গেল না, কোম্পানির দালাল হিসেবে সংবাদপত্রে আখ্যাত শ্রীউইনেশ্বর নাথ চাড্ডা মহাশয়ও ভারতের সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে প্রায় অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে প্রশংসাপত্র বিলোবার জন্যে বোফর্স কোম্পানিকে ভারতে আসতে হয়েছিল। দুই কর্তাব্যক্তি বোফর্স কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট পার ওভ মোরবার্গ এবং কোম্পানির প্রধান কৌঁসুলি লারস গথলিন ভারতে এসে প্রশংসাপত্র বিলিয়ে গেছেন। শ্রীচাড্ডার বেলায় তা হ'ল না। শ্রীচাড্ডা মার্কিন দেশ থেকে নড়তেই চাইলেন না। মার্কিন সরকারও রাজি হলেন না শ্রীচাড্ডাকে বিচারের জন্য ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করতে।

শ্রীচাড্ডাও ভয় পেয়ে গেলেন, চিকিৎসকের নির্দেশপত্র দিয়ে জানালেন তাঁর বুকের অসুখ হয়েছে, এই সময়ে দূর দেশ ভারতে যাওয়া সম্ভব নয়। মার্কিন সরকারের মনোনীত ডাক্তারও সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে শ্রীচাড্ডা বিশেষভাবে অসুস্থ বলেই ভারতে হাজির হ'তে পারবেন না। অতএব চারিত্রিক প্রশংসাপত্র সংগ্রহে ভারত সরকারের পদস্থ কর্মচারিরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজিরা দিলেন। শ্রীচাড্ডা ভাবতেই পারেন নি যে আসলে সামান্য এক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাঁর ভারতে আসার জন্য সরকারের এত বড়ো তাগিদ ছিল। জানা থাকলে সম্ভবত বুকের অসুখ মিলিয়ে যেত।

যাই হোক, তিনি তাঁর মনিব কোম্পানির মতোই প্রশংসাপত্র বিলোতে কার্পণ্য করেন নি। বোফর্স কামান কেনা-বেচায় কোনো ভারতীয়কে ঘুষ বা উৎকোচ দেওয়া হয়নি, ভারত সরকারের প্রতিনিধি মার্কিন মুলুকে হাজির হ'য়ে স্বকর্ণে ঘোষণাটি শুনে এলেন, সঙ্গে অবশ্যই দুই আইনজীবী ছিলেন। তাঁরা ভারত থেকে

দিল্লীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান শ্রীঅনিল কুমারের সঙ্গেই মার্কিন দেশে হাজির হয়েছিলেন।[১] সংবাদপত্রেই প্রকাশ, ঐ দুই আইনজীবী শ্রীচাড্ডার পরামর্শদাতা—ভারত থেকে এঁদের সঙ্গে করেই মার্কিন দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শ্রীচাড্ডা বিদেশী তিন কোম্পানির নাম-ই দিয়েছেন—যে কোম্পানিগুলির নাম বোফর্স কর্তারা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে দিতে আপত্তি জানিয়ে; এমন কি ভারতের সংসদীয় যৌথ তদন্ত কমিশনের কাছে ঐ সাক্ষ্য দিতে কোম্পানির কর্তাদের আপত্তি ছিল। বোফর্স কোম্পানির বেতনভুক শ্রীচাড্ডা ভিন্ন কথা যে বলবেন না সে সম্পর্কে ভারত সরকারের সন্দেহ ছিল কি? তিনি আরও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই তিন কোম্পানির সঙ্গে কোনো ভারতীয় যুক্ত নয়—এই তিন কোম্পানির মারফৎ কোনো ভারতীয়কে ফালতু টাকা বা ঘুষ পাইয়ে দেওয়া হয়নি। সুতরাং অভিযোগ থেকে বচ্চন ভাইদের মতো প্রধানমন্ত্রীও মুক্তি পেয়ে গেলেন।

বোফর্স কোম্পানির প্রশংসাপত্র, শ্রীউইনেশ্বর চাড্ডার স্বীকৃতি—দুটি নথি এখন ভারত সরকারকে ও প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে বলে সংশিলষ্ট পক্ষ মনে করছেন।

আসলে দেশ ছেড়ে মার্কিন সবুজ কাড নিয়ে ওদেশে বসবাস করার অধিকার প্রয়োগ কবার সুযোগটুকু হাতছাড়া করতে শ্রীচাড্ডা আশঙ্কিত ছিলেন। স্বদেশ বা মাতৃভূমি ছেড়ে পালাবার সময়ে তিনি ভারত সরকারের অভিপ্রায়টি ধরতে পারেন নি। যদিও তিনি নিজেকে সৎ বলে বিশ্বাস করেন এবং তা সংবাদপত্র মারফৎ জাহিরও করেছেন,[২] তা সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে পালাবার কি কারন সেটি প্রকাশ করেননি এবং তিনি এটিও পরিষ্কার ভাবেই জানতেন যে বোফর্স কোম্পানি তাঁকে বিপন্ন করার মতো কোনো দুঃসংবাদ প্রকাশ করবে না—তবু শ্রীচাড্ডা মহাশয় স্বদেশ ছেড়েই পালিয়ে

১. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, জানুয়ারি ২২, ১৯৮৮।

২. ইন্ডিয়া টুডে, মে ১০, ১৯৮৭।

গেলেন এমন এক সময়ে যখন বোফর্স কোম্পানির উৎকোচ প্রদান নিয়ে দেশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে চলেছে।

১৯৮৭-র এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখে সুইডিশ জাতীয় রেডিও থেকে বোফর্স কোম্পানি প্রদত্ত ঘুষের সংবাদ প্রচারিত হলো। শুরু হয়ে গেল দেশ জুড়ে তুমুল হৈ চৈ। শ্রীচাড্ডার নামও তখন সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়নি—এমন এক মুহূর্তে মে-মাসের প্রথম দিকেই পুত্র হর্ষনাথসহ চুপি-সাড়ে তাঁর পলায়ন ঘটলো। তখনো তাঁর বক্ষ যন্ত্রণা বা পীড়া শুরু হয়নি যেটি শুরু হয়েছিল মার্কিন দেশে পা রাখতেই। তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে বাধাদানে মার্কিন সরকারি অনুশাসন বাধার সৃষ্টি করে নি, যদিও ভারত খ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরির অনুসন্ধানী সংবাদে জানা যায় শ্রীচাড্ডা এই সময়ের মধ্যে একবার লন্ডনে এসেছিলেন[৩] এক বন্ধুর ডাকে। ওই বন্ধুটির কাছেই শোনা সংবাদ জেনে শ্রীশৌরি জানিয়েছেন—কামান চুক্তির ব্যাপারে বোফর্স মোট একশো-বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এই চুক্তিটি পেতে বোফর্সের এতো বেশি জরুরী তাগিদ ছিল যে চুক্তি স্বাক্ষর হবার আগেই তারা ৪ কোটি ডলার বিলিয়েছে। শ্রীচাড্ডার মতে এই টাকা বিলোবার পরেই ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বী কামানের প্রতিকূলে ও বোফর্স কামানের অনুকূলে যায়। কথাটি তিনি লন্ডনবাসী বন্ধুকে জানিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে, যে ফালতু টাকা বা সম্পদ বোফর্স কোম্পানি বিলিয়েছে, চুক্তিতে কিন্তু এমনভাবে ভারতের টাকা বিলোবার কথা ছিল না। তাছাড়াও, ভারতকে কামান বেচার কারণে তিন বিদেশী কোম্পানিকে কেন টাকা পাইয়ে দিতে হবে তার কোনো সদুত্তর বোফর্স কর্তারা দেননি। এই কামান বেচা সংস্থাটিকে ভারত সরকার বাধ্য করতে পারেনি—এটাই হল বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারত সরকারকে আরো সহ্য করতে হয়েছে

৩. বর্তমান, জানুয়ারি ২৭, ১৯৮৮।

এই অস্ত্র ব্যাপারীর দম্ভ যে তারা ভারতীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির (জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি) সামনে কোনো কথা প্রকাশ করবেন না এবং অন্যত্র যে বিবৃতি দেবেন তা লিখিত বিবৃতি হবে না, হবে মৌখিক।

আরো জানা গেছে, এই তিনটি কোম্পানির একটির সঙ্গে জর্ডনের রাজার যোগাযোগ রয়েছে[৪] যিনি একাধিক বার ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে মূল্যবান উপহার দান করেছেন। বোফর্স কোম্পানির আচরণে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল যে তাঁরা কোম্পানি-গুলির নাম ভারত সরকারের কাছে এই শর্তে জানিয়েছেন যে নামগুলি যেন জনসমক্ষে প্রকাশ না পায়।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, এই সময়টিতে বোফর্স কর্তারা তিন কোম্পানির নাম ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আরো কয়েকটি মাস কেটে গেলেও নতুন বছরে (১৯৮৮) এখনো পর্যন্ত তদন্ত কমিটিকে নামগুলি সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল করেননি।[৫] তদন্ত কমিটিও তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে বিদেশী কোম্পানি এবং ভারত সরকারের অবজ্ঞা সহ্য করে গেলেন। যৌথ সংসদীয় কমিটিকে কামান বেচা সংস্থাটি যে স্বীকৃতি দেয় নি এই অবজ্ঞা ভারত সরকারও হজম করে গেছেন। এতো সব বিস্ময়কর ব্যাপারের পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা উদ্‌ঘাটিত হয়নি ব'লেই সব ব্যাপারটি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের গল্প কাহিনীর মতো রহস্যময় হয়ে রইলো।

এর পরে প্রশ্ন আরো রয়েছে, চুক্তি ভেঙে টাকা দেওয়া হয়েছে বাইরের কোম্পানিকে। এই চুক্তি কেন ভাঙা হলো তার কৈফিয়ৎ বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে চাওয়া হয়নি। তৃতীয় পক্ষ কোনো টাকা পাবে না ভারতকে কামান বেচার দরুন এই শর্তটি মানা হয়নি —কোম্পানির হাত দিয়ে ভারতের টাকাই এমন তিনটি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে যাদের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. দ্য স্টেটসম্যান, ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৮।

৫. দ্য স্টেটসম্যান ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৮।

ভারতের করদাতাদের টাকা এমন কতকগুলি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে যারা টাকা রাখে সুইস ব্যাঙ্কে। এই কোম্পানি-গুলির মধ্যে একটি সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি ব'লে ঘোষিত হ'লেও অন্য দুটি কোম্পানি ভিন্ন দেশের। কিন্তু তিনটি কোম্পানির টাকার সবটাই সুইস ব্যাঙ্কে সাংকেতিক নামে জমা দেওয়া হয়েছে এমন মর্মে খবর সুইডিশ জাতীয় রেডিও থেকে যেমন ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি সুইডেনের সরকারি কৌঁসুলি লারস রিংবার্গও প্রকাশ করেছেন। সাংকেতিক নামে গোপন একাউন্টে সুইস ব্যাঙ্কে কাদের টাকা থাকে? যারা সৎভাবে প্রকাশ্য ব্যবসার মধ্যে যাতায়াত করে না তারাই সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কগুলির পৃষ্ঠপোষক। এমন কোম্পানিগুলিকে অজ্ঞাত কারণে ভারতেব করদাতাদের টাকা কেন দেওয়া হ'য়েছে ভারত সরকার সেই কৈফিয়ৎ দাবি করেন নি ব'লেই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর।

এইসব ঘটনার গতিধারাই ভারত সরকারের আচরণ বা প্রশাসনের শীর্ষে অধিষ্ঠিত মানুষগুলির আচরণ ও কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়।

প্রথমত, ভারতে আগত বোফর্স কোম্পানির আচরণের মধ্যে ভারত সরকার কোনো অসঙ্গতি দেখেন নি। ওই সংস্থার আচরণ ভারত সরকারকে সন্তুষ্টই করেছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীউইন চাড্ডার বিরুদ্ধে বেআইনি বিদেশী অর্থ সংক্রান্ত মামলা উত্থাপন করে ভারত সরকার শ্রীচাড্ডাকে ভারতে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে মার্কিন অনিচ্ছা সহর্ষে মেনে নিয়েছেন। ভারত থেকে পদস্থ সরকারী কর্মচারি অভিযুক্ত শ্রীচাড্ডার সঙ্গে মার্কিন মুলুকে গিয়ে সাক্ষাৎ করে তাঁর বক্তব্য জেনে এসেছেন।

শ্রীচাড্ডা সম্পর্কিত ঘটনাটির চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর পারিবারিক বন্ধু আদিল শাহরিয়ার-এর মার্কিন মুলুক সম্পর্কিত সমস্যা বেশি জরুরী ব'লে ঠেকেছে। আদিল শাহরিয়ার হলেন নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ মহম্মদ ইউনুসের পুত্র। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোপনে মাদক চালানের ব্যাপারে এবং ইনসিওরেন্স

সংক্রান্ত কারচুপির ব্যাপারে জেলে আটক হয়েছিলেন।[৬] কানাডা ফেরৎ আমেরিকায় গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট রেগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযুক্ত শাহরিয়ার-এর আটক-মুক্তি ঘটিয়েছেন কিন্তু জাতীয় স্বার্থে বিচারের প্রয়োজনে অভিযুক্ত শ্রীউইন চাড্ডাকে ভারতে প্রেরণের জন্য একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি।

শ্রীচাড্ডার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগটি তুলেই নিতে হবে কিন্তু জানা যাবে না কেন শ্রীচাড্ডা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে প্রতিমাসে দু'লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন। শ্রীচাড্ডা যে কারণটি দেখিয়েছেন, ভারতে অবস্থানরত বোফর্স কোম্পানির লোকদের বাসস্থান, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার জন্য এই পারিশ্রমিক। আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মরত ছ'টি বাণিজ্যিক সংস্থার মালিক কোটিপতি উইন চাড্ডা এমন তুচ্ছ কাজের জন্য মাসে দু'লাখ টাকা পারিশ্রমিক পাবেন এ সংবাদ কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য ?

বোফর্স কোম্পানির প্রশংসাপত্র, শ্রীচাড্ডার বিবৃতি হয়তো এখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গদী টিকিয়ে রাখবে কিন্তু বিশ্বের লোকচক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আসনটির মর্যাদা অনেকখানি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'ল এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর সেই সময়কার আচরণে, যখন বোফর্স কর্তারা ভারতে আসেন। চোদ্দ থেকে আঠারোই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭)—এই ক'টি দিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সবচেয়ে জরুরী কাজ যা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল, খরাপীড়িত এলাকা পরিদর্শন, তা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ক'টা দিন তিনি দিল্লীতেই কাটালেন কেন ? কামান বেচা একটি সংস্থা দিল্লী এসে পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের কোনো কার্যক্রম তাদের ছিল না, তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সব কাজ ফেলে দিল্লীতে অবস্থান ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত রহস্যময় ঠেকেছে।

---

৬. দ্য স্টেটসম্যান, ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৮৮।

কোম্পানির লোকেরা সরকারি পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে চারদিনে মোট আঠারো ঘন্টা কথাবার্তা চালিয়েছেন। এই আঠারো ঘন্টা সাক্ষাৎকারে তাঁরা যতটা রহস্য ফাঁস করেছেন তার চেয়ে বেশি জিনিস জটিল ক'রে দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত তাঁরা বারে বারে বলে এসেছেন কোনো ফালতু টাকা চুক্তি-মতো কাউকেই দেওয়া হয়নি---শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন টাকা দেওয়া হয়েছে তবে সেটি দালালি বা ঘুষ নয়। দালাল কোম্পানি-গুলি কাজ গুটিয়ে নিচ্ছে বলে খেসারত দিতে হচ্ছে।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল ৫০ কোটি টাকা ফালতু দেওয়া হয়েছে কিন্তু সরকারের কাছে সাক্ষাতে তাঁরা জানিয়েছেন পরিমাণটি আরো বেশি ৬৫ কোটি থেকে ১৫০ কোটি। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থায় অপরিষ্কার জলটি আরও ঘুলিয়ে দেওয়া হলো—প্রকাশ্যে জানা গেলনা কারা বাড়তি টাকা পেল, তার পরিমাণটি ঠিক কত, আর বিশ্বের সব দেশ বাদ দিয়ে সুইস ব্যাঙ্কে গোপন একাউন্টে টাকা জমা দেওয়া হ'ল কেন? চারদিনের এই ঘটনায় ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে কোনো কিছু উদ্ঘাটিত না হ'লেও বোফর্স প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থে যে ভারত ভ্রমণে সফল হয়েছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মূল ঘটনাটিকে আড়াল করে দেওয়ার জন্যে পাকাপাকি ভাবেই জাল বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। অর্ধসত্য, পূর্ণ অসত্য যে সব তথ্য দেওয়া হল সেগুলি ভারত সরকার বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন। এর ফলে অবশ্যই ঘটনার রঙ ও চরিত্র পাল্টে যায় নি।

এই সূত্রে সুইডেনের নোবেল কোম্পানির চেয়ারম্যানের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। নোবেল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর শাখা সংস্থা বোফর্স কোম্পানি। নোবেল কোম্পানির চেয়ারম্যান লারস্ এরিক থুনহেলেম ২৬ আগস্ট ১৯৮৭, তারিখে বলেছিলেন, ভারতীয় এবং অভারতীয় উভয়পক্ষই টাকা পেয়েছে। তখন মামলার অবস্থান এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো যখন বোফর্স সংস্থা আসামীর

কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে। তার পরেই বিবৃতির নানা টানা-পোড়েন চললো। টাকা দেওয়া হয়েছে বটে তবে সেটি ঘুষ নয়, দালালিও নয়—কাজ গুটিয়ে ফেলার খেসারত মাত্র।

এইসব উক্তি কতখানি সত্য সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। কারণ বোফর্স কোম্পানি বেআইনি কাজের জন্য স্বদেশে অভিযুক্ত। দেশের আইন ভেঙে যুদ্ধরত ইরাণে এই কোম্পানি গোপনে যুদ্ধাস্ত্র পাচার করেছে। ভারতে এসে তারা কাজের কাজ যেটি করতে পেরেছে তা হলো প্রধানমন্ত্রী ও বচ্চন-ভাইদের সার্টিফিকেট দান। প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার এতেই সন্তুষ্ট। প্রতিদানে ভারতে আরও বোফর্স কামান, প্রাথমিক সরবরাহ চুক্তিমতো ৪১০টির পর আরো বেশি কামান ভারতে তৈরি করা যাবে ব'লে লাইসেন্সের মূল্য বাবদ বোফর্স কোম্পানি আরো কয়েক হাজার কোটি টাকা পেয়ে যাবে বলে আশ্বাস নিয়ে গেছে—সংবাদপত্রে এমন খবরও বেরিয়েছে। এত কোটি কোটি টাকা সুইডেনের প্রাপ্য হ'লে সেদেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, শিল্পোৎপাদন বাড়বে এমন একটি সম্ভাবনা সুইডিশ সরকারকেও প্রলুব্ধ করেছে। এই প্রলোভনে ভারত-বোফর্স চুক্তির বেআইনি দিকটির জন্য সুইডিশ সরকারের তাই মাথাব্যথা নেই।

তবে শোনা যাচ্ছে আরো একটি নতুন চুক্তির কথা। এই আশ্বাসও নাকি বোফর্স কোম্পানি নিয়ে গেছে। বোফর্সের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রের খদ্দের হবে ভারত। ভারতে আগমন ক'রে বোফর্স কোম্পানি সব দিক থেকেই লাভবান হয়েছে। স্বদেশে অভিযুক্ত এমন একটি চোরা কোম্পানিকে ভারত সরকারের কেন পছন্দ হ'ল সেটাই বিস্ময়কর। কেবল গোপনে অস্ত্র পাচারের ঘটনাই নয় এই বোফর্সের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের হিসাবপত্র, টাকাকড়ি সবই সুইস ব্যাঙ্কের সঙ্গে গোপন অন্ধকার পথে পরিচালিত হয়।

সংসদের তদন্ত কমিটি তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তবে যে সব খবর এখন সরকারিভাবে প্রচারিত তার চেয়ে বেশি কিছু জানা

যাবে কিনা সন্দেহ। ফেয়ারফ্যাক্স তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদন সেই-দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধাস্ত্রের বাজারে যে কালো টাকার খেলা এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই চালু হয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ব্যবসায়ের সঙ্গে কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত সম্পর্ক বিশ্বের সাধারণ মানুষের কাছে আশঙ্কার বিষয়। কিছু কিছু ঘটনার ইতিবৃত্ত এবং ঘটনা-প্রবাহের গতিধারা ধনতান্ত্রিক সমাজে বর্তমানে কীভাবে পরিচালিত হয় সংক্ষেপে সেই বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

বোফর্স কামানের গোপন গর্জন

ভূপৎ রাই ওঝা ছিলেন সুইডেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। কর্মজীবন প্রায় শেষ ক'রে এনে সুইডেনের মত শান্তিকামী নির্ঝঞ্ঝাট দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। শেষ কর্মজীবন যে নিরুপদ্রবে কাটবে এমন আশা অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এলো ষোলো-ই এপ্রিল, ১৯৮৭। সেদিন সুইডিশ জাতীয় রেডিও থেকে ঘোষিত হ'ল, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা ও ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তারা সুইডেনের বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে উৎকোচ বা কমিশন পেয়েছেন। বোফর্স কোম্পানি ভারতকে ৪১০টি ১৫৫ মিলিমিটার ফিল্ড হাওইটজার—৭৭, এই নামের কামান সরবরাহ করবে বলে চুক্তি হয়েছে। প্রায় শুকনো আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো এই দুঃসংবাদ কেবল শ্রীওঝাকে নয় ভারতীয় রাজনীতির শেকড় ধরে টান লাগাবার উপক্রম করেছে।

এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিল্লীতে গদিনসীন ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলটিকে এমন এক সময়ে বেকায়দায় নিয়ে গেল যখন একটির পর একটি সংকটে নবীন প্রধানমন্ত্রী প্রায় পযুর্দস্থ অবস্থায়। ১৯৮৭ সালের শুরুটাই ছিল অভিশপ্ত। ফেয়ারফ্যাক্স নিয়ে বিতর্ক, বিদেশ সচিবের পদত্যাগ, জার্মান ডুবোজাহাজ কেনায় গোপন টাকার লেনদেনের সংবাদ ফাঁস, পাক-ভারত সীমান্তে সামরিক টানা পোড়েন, ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মনান্তর, হরিয়ানা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয়। ঘটনাগুলি একের পর এক শুধু দিল্লীর শাসক দলটিকে নয় ভারতীয় রাজনীতির বাতাবরণকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। একের পর এক এই সব ঘটনা ভারত সরকারের ভাবমূর্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধূলিসাৎ করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করে ফেলেছে।

স্টকহোম থেকে সুইডিশ রেডিওর ঘোষণায় বলা হয়েছিল

৩৩ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার (প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা) গোপন সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় একাউন্টে জমা পড়েছে। সুইডিশ রেডিও-র সংবাদ ঘোষণায় জানানো হ'ল তিন কিস্তিতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন সুইডিশ টাকা (ক্রোনার) নভেম্বর মাসে (১৯৮৬) এবং আড়াই মিলিয়ন ক্রোনার ডিসেম্বর মাসে কোনো এক সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় আমানতের সাংকেতিক নামটি 'লোটাস'।

সুইডেনের জাতীয় রেডিওকে যিনি সংবাদটি দিয়েছেন তাঁর নাম ম্যাগনাস নিলসন। তাঁর মতে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে তিনি জেনেছেন বোফর্স কোম্পানির সুইডেনস্থ ব্যাংক 'স্ক্যান্ডিনেভিস্কা এনস্কিলডা ব্যাঙ্কেন' সুইজারল্যান্ডের অন্যতম বৃহৎ ব্যাংক সুইস ব্যাঙ্ক করপোরেশনে এই অর্থ জমা দিয়েছে। নিলসনের সহযোগী হিসেবে আরো তিনজন সাংবাদিক বন্ধু এই গোপন সংবাদ উদ্ধারে উদ্যোগী ছিলেন। তিন সহযোগী হলেন, জ্যান মোসানডার, বোরজে রামডাহল এবং টারবিজর্ন স্প্যাঙ্স। এঁরা সকলেই বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহে পারদর্শী।

এই চার সাংবাদিকের দলটি সুইডেন থেকে বেআইনিভাবে গোপনে অস্ত্র পাচারের ঘটনা উদ্ধার করেন। গোপন অস্ত্র পাচারের নায়ক হ'ল বোফর্স কোম্পানি—অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধরত ইরাণে—তৃতীয় পক্ষ সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রের মারফৎ। সুইডেনের রাষ্ট্রীয় নীতি হ'ল, যুদ্ধরত কোনো দেশে সুইডিশ মারণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে না। রাষ্ট্রীয় কানুনটি বোফর্স কোম্পানি গোপনে অগ্রাহ্য করে গেছে।

বোফর্স কোম্পানির গোপন বেআইনি কার্যকলাপ এঁদের চেষ্টায় সুইডেনে প্রকাশ পায়। ভারতের সঙ্গে কামান সরবরাহ করার চুক্তি স্বাক্ষরের সামান্য কিছু আগে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। সুতরাং বোফর্স কোম্পানির সুনাম স্বদেশে আহত অবস্থাতেই ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে আবার সুইস ব্যাঙ্ক ও উৎকোচ সংক্রান্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায়।

একটি ভারতীয় সংবাদ সাময়িকীর[১] সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রামডাহল এবং নিলসন জানান, তাঁদের কাছে যথেষ্ট নথিপত্র ও প্রমাণ রয়েছে। এ সবের ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা বলে দিতে পারেন কোন্ তারিখে কত টাকা কোন্ ব্যাঙ্কে কোন্ সাংকেতিক আমানতে জমা পড়েছে। সুইডেনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে বোফর্স-ভারত চুক্তির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বলেই তাঁদের মনোযোগ এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পালমেই ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এই বেচাকেনায় কোনো দালাল বা তৃতীয় পক্ষ থাকবে না।

সুইডেন থেকে কামান সরবরাহে সুইডিশ প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ ছিল দেশগত কারণে। কামান সরবরাহের ফলে ভারত থেকে প্রচুর টাকা আসবে। এই টাকায় সুইডেনের বেকার সমস্যার কিছু সুরাহা হ'তে পারে—বোফর্স কোম্পানির উৎপাদন বাড়বে, কর্মচারী নিয়োগ বাড়বে, জাতীয় আয়ও বাড়বে। বোফর্স কোম্পানির সঙ্গে ভারত সরকারের এই চুক্তি সুইডেনের কাছে সৌভাগ্যদায়ক বলেই তিনি মনে করেছিলেন।

সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণার কিছুদিন বাদেই ওই রেডিও সংস্থার অন্যতম সংবাদদাতা রোল্ফ প্রসীরীড নয়াদিল্লী এসে পৌঁছান। উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ সংগ্রহ। বিশেষ ক'রে সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণার পর দেশজ প্রতিক্রিয়াটি সাক্ষাতে জানা। যে ক'দিন তিনি ভারতের রাজধানীতে ছিলেন, গুপ্ত পুলিশ ছিল পেছনে ছায়ার মত। ভারতের বিদেশ দপ্তরে তাঁকে কয়েকবার হাজির হতে হয়েছে ভারত সরকারের তাগিদে। তাঁর কাছ থেকে বারেবারেই জানতে চাওয়া হয়েছে বোফর্স সংক্রান্ত কোনো গোপন নথি আছে কি-না।

একটি সাক্ষাৎকারে সুইডিশ রেডিও-র সংবাদদাতারা বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বিস্ময় হ'ল, সুইডিশ সরকার

১। ইন্ডিয়া টু-ডে. ১৫ই মে ১৯৮৭।

গোপন টাকাকড়ির লেনদেন-এর ব্যাপারে চুক্তি-ভঙ্গকারী বোফর্স কোম্পানীকে কোনো চাপ দিচ্ছে না কেন? তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র সরকার-ই পারেন বোফর্স কোম্পানির এই গোপন বেআইনি কাজের হদিশ খুঁজে বার করতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে—যেমনটি ইরাণে বেআইনি অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ঘটেছে।

ব্যাপারটি আবার ভারত সরকারের কাছেও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেই কারণেই এই ঘটনা সংক্রান্ত সারা দেশের প্রতিক্রিয়া মোটেই সুখকর নয়। ঘটনার মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারত সরকারকে যথেষ্ট নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে। বোফর্স ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে অন্যান্য প্রসঙ্গঃ ফেয়ারফ্যাক্স প্রসঙ্গ, জার্মান সাবমেরিন প্রসঙ্গ, অজিতাভ বচচনের সুইস সম্পত্তি, সুইস ব্যাংকে ভারতীয় কালো টাকা প্রসঙ্গ।

ভারতের লোকসভায়-রাজ্যসভায় বোফর্স সংক্রান্ত বিতর্কে সরকারের পক্ষ থেকেই পরস্পর বিরোধী উক্তি, অপ্রাসঙ্গিক উক্তি সব শোনা গেছে। এমন কি প্রধানমন্ত্রীও সময়ে সময়ে বিরোধী পক্ষের আক্রমণের সামনে নাজেহাল হ'য়েছেন—সরকারের লোক-গ্রাহ্য প্রতিষ্ঠা বেশ খানিকটা বিধ্বস্ত হয়েছে। মন্ত্রীরা পরস্পর-বিরোধী উক্তি দিয়ে, কখনো ভুল স্বীকার করে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। সংসদে অনেক বাক্যজাল ছড়ানো হ'য়েছিল। কিন্তু সরকারি তরফে জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারেন নি কেউ-ই। শেষ পর্যন্ত অন্যতম মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তাঁর পদত্যাগের ঘটনায় সকলকেই চমকে দিলেন। বিশ্বনাথ প্রতাপের পদত্যাগ ভারত সরকারের বিশ্বাসযোগ্য আচরণের স্থিতিশীলতা চুরমার ক'রে দিয়েছে। তার পরেও ঘটেছে মন্ত্রী অরুণ সিং-এর পদত্যাগ এবং অমিতাভ বচ্চনের লোকসভা ত্যাগ।

অবশ্য সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণার আগেই বিভিন্ন ঘটনায় দিল্লির সরকারের জনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি মলিন হ'তে থাকে। শুরুতে

অবশ্য এই ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য বিশ্বনাথ প্রতাপের কাজের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল। দেশের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অপরাধীদের খুঁজে বার করা, তাদের কীর্তি কাহিনী জনসমক্ষে উন্মোচিত করা—এইসব ঘটনা একটা পর্যায়ে রাজীব গান্ধীর নতুন সরকারকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে কিছুদূর হয়তো এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক সমাজের পিছুটান-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। বিশ্বনাথ প্রতাপকে, বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন অজুহাত দেখিয়ে অর্থমন্ত্রক থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর সহযোগী ভুরেলালকেও রাজস্ব বিভাগ থেকে। ভুরেলালের সহযোগী বিনোদ পান্ডের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোপন সম্পদের চালান ব্যাপারে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগ নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক তোলা হয়—নিয়োগের ব্যাপারে দায়িত্ব ছিল রাজস্ব বিভাগের। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেসে ওঠে জার্মান সাবমেরিন ক্রয় সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী—উৎকোচ ও বেআইনি অর্থের লেনদেন, অজিতাভ বচ্চনের দেশত্যাগ ও গোপনে সুইস সম্পত্তির মালিকানা অর্জন। ঘটনাগুলি ভারত সরকারের ভাবমূর্তি যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান ক'রে দিতে অসমর্থ হয়নি। ঠিক এমনই এক মুহূর্তে ষোলই এপ্রিল সুইডিশ রেডিও-র বিস্ফোরণ। প্রতিরক্ষা দপ্তরের পদস্থ অফিসারদের একাংশ এবং দিল্লীর প্রশাসনিক রাজনীতির কর্তাব্যক্তিরা বেআইনি টাকার লেনদেন-এর অভিযোগে জড়িয়ে পড়লেন।

১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ লোকসভায় ফেয়ারফ্যাক্স সংক্রান্ত বিতর্ক শুরু হওয়াতেই যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপকে আক্রমণ করে লোকসভায় বক্তব্য রাখলেন তাঁরই স্বদলীয় নেতা ও সহকর্মী দীনেশ সিং। আরেক নেতৃস্থানীয় লোকসভা সদস্য পি আর কুমারমঙ্গলম জানালেন, ফেয়ারফ্যাক্স আন্তর্জাতিক গুপ্তচর সংস্থা, এই প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ

ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্র-মন্ত্রী ব্রহ্ম দত্ত জানালেন, ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগ বেআইনি নয়—বিদেশে গোপনে ভারতীয় টাকা পাচারের ঘটনা অনুসন্ধানে এই সংস্থাকে নিয়মমাফিক কাজে লাগানো হয়েছে—এই নিয়োগ ক্ষতিকর নয়।

বিশ্বনাথ প্রতাপকে জিজ্ঞেস করা হ'য়েছিল, এই সংস্থাকে কাজে নিয়োগের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়া হ'য়েছিল কি-না। বিশ্বনাথ জানালেন, একথার উত্তর দিতে হ'লে প্রধান-মন্ত্রীর সম্মতি দরকার।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া যায় নি—অতএব বিশ্বনাথ প্রতাপের উত্তরটিও পাওয়া গেল না।

সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণার দশদিন বাদে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের সভা ডেকে রাজীবজী জানালেন, সুইডেন জানিয়েছে বোফর্স চুক্তির মধ্যে কোনো দালাল নেই এবং ওই খাতে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি।

পরদিন ২৮ এপ্রিল রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী জানালেন, সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট কোনো উত্তর পাইনি। তাদের উত্তর আমরা আশা করছি।

প্রধানমন্ত্রীর পর পর দু' দিনের উক্তি পরস্পরবিরোধী।

এইসব ঘটনা আর উক্তি থেকে কোনো নিশ্চয়কৃত স্পষ্ট উত্তর বেরিয়ে আসে না। রাজনৈতিক আকাশে উত্তাপের সঞ্চার হয়। তবে ভারত সরকার এমন একটি নির্বিকল্প আচরণের জন্ম দিতে পেরেছেন যাতে মনে হ'তে পাবে সরকার মুক্ত মনের পরিচয় দিচ্ছেন—লুকোবার কিছু নেই।

অবশ্যই ভারত সরকারের স্বপক্ষে বলার মতো নথি ছিল বৈকি! ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এক্সেল এডেলস্ট্যাম ১৮ এপ্রিল (১৯৮৭) বিদেশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং-কে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন ; তাতে বলা হয়েছিল ঃ 'বোফর্স কোম্পানি ১৯৮৫ সালে সুইডিশ সরকারকে জানায় কোনো মধ্যস্থ

বা দালাল রাখা হয়নি—ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ হচ্ছে।

এটাই হ'ল সরকারের হাতে প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ। এই সাক্ষ্য শোনা গেল আঠারোই এপ্রিল—সুইডিশ রেডিও ঘোষণার দু'দিন বাদেই। ১৯৮৫ সালের একটি বিবৃতির ওপর ভিত্তি করে সুইডিশ সরকার যে সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছেন তার সাহায্যেই ভারতীয় রাজনীতির কর্তাব্যক্তিরা মাথা বাঁচাবার সুযোগ পেলেন।

শুধুমাত্র ৪১০ টি কামান কেনা নয় ভারতবর্ষে ওই কামানের উৎপাদনের সুযোগ পাওয়ার জন্য লাইসেন্স কেনা—সব মিলিয়ে চুক্তি হয়েছে বলে জানা যায়। চুক্তির প্রাথমিক স্তরে টাকার পরিমাণ ১৭০৪ কোটি টাকা—পরে আরো বেড়েছে কিনা জানা যায়নি। একটি মাত্র পণ্য থেকে এত বেশি সম্পদ আহরণের সুযোগ সুইডেন আগে কখনো পায়নি।

১৯৭৭ সালে প্রথম কথাবার্তা শুরু হয়। ওই বছরে পাকিস্তান মার্কিন হাওইটজার কামান সংগ্রহ করে। এই ঘটনা ভারতকেও হাওইটজার কামান সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুই-ডেনসহ ছ'টি দেশের সঙ্গে ভারত সরকার যোগাযোগ করেন।

১৯৮১ সালে দেখা গেল চারটি দেশ রয়েছে কামান বেচার প্রতিযোগী হিসাবে—বোফর্স এফ এইচ ৭৭, ব্রিটিশ-জার্মান-ইতালিয়ান এফ এইচ ৭০, অস্ট্রিয়ান জি-এইচ-এন ৪৫ এবং ফরাসী গিয়াট ১৫৫ টি-আর।

১৯৮১ থেকে, দরদস্তুর, পছন্দ অপছন্দ ও নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে বোফর্স কামান কেনার সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন।

কোন দেশের কামান কেনা হবে বছর কয়েক ধ'রে তার টানা

হৈচৈ চলেছিল। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত কামানগুলির পরীক্ষা কার্য চলে।

অস্ট্রীয় কামান সবচেয়ে সস্তা কিন্তু ওই কামানের জন্যে গোলাবারুদ কিনতে হবে বেলজিয়াম থেকে। বোফর্স কামান প্রাথমিক পরীক্ষার ঘোষিত দূরত্বে (৩০ কিলোমিটার) তাদের গোলা পাঠাতে পারেনি যা পেরেছিল ফরাসী কামান। ব্রিটিশ গোষ্ঠীর কামানও দূরত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ভারতীয় সেনাবিভাগের পছন্দ ছিল ফরাসী কামান। জানা গেছে, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এ. এস. বৈদ্য ফরাসী কামানের পক্ষে ছিলেন।

প্রতিযোগিতার গুরুত্ব দেখে রাজনৈতিক উঁচুমহলে ধরাধরি শুরু হয়ে যায়। ফরাসী প্রেসিডেন্ট, অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাবার চেষ্টায় ছিলেন সকলেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোফর্স হাওইটজার দাম কমিয়ে এবং নানা প্রথায় ধরাধরি করে বিশেষ ধরনের প্রভাব খাটিয়ে জিতে যায়। এরপর থেকেই গোলমালের শুরু।

ঠিক কামানটি কেনার জন্য সরকারকে দীর্ঘ সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাধারণত এত দীর্ঘসময় লাগে না। কুশলী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক আগেই নিজেদের মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন—তবু বিলম্ব হওয়ার কারণ রয়েছে।

তবে যুদ্ধ সরঞ্জামটির ব্যবহারিক দিকের কথা ভেবে সাত থেকে আট বছর সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক ঠেকে। পরে শোনা যায়, এই কামানটি কেনার ব্যাপারে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক পান্ডা ঘটনার মধ্যে এসে পড়েন। তার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

*   *   *

আন্তর্জাতিক যুদ্ধাস্ত্রের বাজারে বৃহৎ অস্ত্র-দালালদের অন্যতম

অ্যাডনান খাসহোগ্গি। সৌদি আরবের অধিবাসী—বিশ্বের বৃহৎ অস্ত্র নির্মাতা সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

ভারতের, একটি পাক্ষিক সংবাদ সাময়িকীর[২] সঙ্গে সাক্ষাৎকারে খাসহোগ্গি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন: যখন দেখা যাবে কোনো সরকারি কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হচ্ছে, বুঝতে হবে রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক স্তরে ফালতু টাকার লেনদেনের ব্যাপার রয়েছে। প্রত্যেক অস্ত্র নির্মাতা কিন্তু তাদের পণ্যের দাম নির্ধারণে প্রস্তুত খরচের ওপরে এই ধরনের ব্যয়টিও যুক্ত করে রাখে। এটি একটি অবশ্যকৃত্য ব্যাপার।

আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনানী ব্রিগেডিয়ার এন. বি. গ্রান্ট ওই সাময়িকপত্রেই অপর একটি বক্তব্যে স্বীকার করেছেন, প্রতিরক্ষা বিভাগে যে কোনো ক্রয় ব্যাপারে চুক্তিতে উৎকোচ আর দালালি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। এসব ঘটনা এতই সুপরিচিত হয়ে গেছে যে এখন আর এগুলি বে-আইনি কাজ-কারবার বলে মনেই হয় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হ'ল এসবের মধ্য দিয়েই অবনত মানের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে।

আর একটি ব্যাপারও এইসব কাজে জড়িয়ে থাকে—রাজনীতি যার মৌল বিবেচ্য—বিশেষ ক'রে তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

সম্পন্ন মানুষের অর্থের ওপর নির্ভর করে থাকে গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। নানাভাবে এইসব দল অর্থ-ভান্ডারের সূত্র সন্ধান ক'রে থাকে। ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রে তা দুর্লভ নয়। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠ-পোষকতার ঘটনা খুবই সুপরিচিত। তবে ইদানিং নতুন রীতির আবির্ভাব ঘটেছে।

প্রকাশ্যে দান বা চাঁদার জন্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মুরুব্বিরা

২. ইন্ডিয়া টু-ডে, ১৫ মার্চ, ১৯৮৭।

এখন আর ঝোলা নিয়ে শিল্পপতি বা পুঁজিমালিকদের দুয়ারে গিয়ে ধরণা দেন না। ১৯৮০ সাল থেকে এটি দেখা যাচ্ছে।

বিখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার এক সংবাদ সমীক্ষায়[৩] তাঁর পর্যবেক্ষণটি বিস্তৃত করেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস (আই) দলটি সম্প্রতি চাঁদার জন্য শিল্পপতি বা পুঁজিমালিকদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন তাঁরা দেখছেন, এসব কাজে দলকে দুর্ণামের ভাগী হ'তে হয়। এঁরা চেষ্টা করছেন ভারতের বাইরে থেকে সরকারি ক্রয় ব্যাপারে চুক্তির মধ্য দিয়ে বাড়তি টাকা পাওয়া যায় কিনা।

বোফর্সের ঘটনায় প্রকাশ্যে দালালির ব্যবস্থা বে-আইনি ব'লে ঘোষিত হ'বার পরেও বহুকোটি টাকার বাড়তি লেনদেন ব্যবসার বাইরে ঘটানো হয়েছে ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু এই সংবাদ সরকার এবং শাসকদল সম্পূর্ণই অস্বীকার করে যেতে থাকে। সারা দেশজুড়ে বিতর্কে, সংবাদপত্রে, পার্লামেন্টে হৈচৈ ও তর্কযুদ্ধের মধ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তবু সরকার বিন্দুমাত্র নিজেদের সাফাই বক্তব্য ছেড়ে নড়েন নি। তাঁদের একটাই কথা, কোনো দালাল এই চুক্তিতে নেই। তবু সরকার সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু জার্মান ডুবোজাহাজ কেনার প্রশ্নে ঘুষ বা উৎকোচের অভিযোগ যে মুহূর্তে উঠেছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে বিশ্বনাথ প্রতাপ সরকারি তদন্তের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু বোফর্সের ব্যাপারে সেই মুহূর্তে তদন্তের কোনো চেষ্টা হলো না, হ'য়েছে অনেক পরে—দেশজুড়ে তুমুল প্রতিবাদ আন্দোলন জেগে ওঠার পর। তখন সুইডিশ সরকারকেও ভারত সরকার সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানাতে পারতেন। সে চেষ্টাও হয়নি।

অভিযোগ উঠেছিল সুইডিশ রেডিওর তরফ থেকেই—

৩. সান-ডে, মে ১০-১৫, ১৯৮৭।

সুইডেনের কেন্দ্রীয় সরকারি ব্যাংক থেকে এই টাকা সুইস ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাছাড়াও সুইডেনের সরকারি অডিট ব্যুরোর রিপোর্টে দালালির প্রসঙ্গ সমর্থিত হয়েছে। সরকারিভাবে ভারত সরকারের তরফ থেকে কোনো তদন্তের অনুরোধ যায়নি।

সুইডেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভূপেৎ রাই ওঝা সুইডিশ সরকারের কাছে সন্ধান চেয়ে অনুরোধ করেন রেডিও থেকে ঘোষিত বক্তব্য সত্যি কিনা জানাতে। দিল্লী থেকে কোনো তাগিদ আসেনি।

উত্তরে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বিভাগের রাজনৈতিক উপদেষ্টা লারস্ ওলফ লিণ্ডগ্রীন জানালেন, বোফর্সের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি নিয়ে কী ঘটেছে তার বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি জানা নেই—এটি বোফর্স কোম্পানি ও ভারত সরকারের ব্যাপার, তাঁরা এর মধ্যে নেই।

পরিষ্কার জবাব! সুইডিশ সরকার সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান।

এতো অভিযোগ আর বিতর্কের মধ্যে ভারত সরকার কিন্তু নিজের সাফাই বক্তব্য থেকে না নড়লেও এমন একটা ভাব জিইয়ে রেখেছিলেন যে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে সরকারের কোনো আগ্রহের অভাব নেই, গাফিলতিও নেই। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই দেখা যাচ্ছিল। প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে অরুণ সিং যখন পদত্যাগ করেন তখন ঘটনার জটিলতা আরো নির্মম হয়ে দেখা দিল।

পনেরোই জুলাই মন্ত্রী অরুণ সিং-এর পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে গিয়ে পৌঁছোয় কিন্তু গৃহীত হয় তিনদিন বাদে—শ্রীসিং-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হবার পরেই। মাঝের দুটি দিন প্রধানমন্ত্রী নিশ্চুপ ছিলেন।

অবশ্য শ্রীসিং জানিয়েছিলেন নিছক ব্যক্তিগত কারণেই তাঁর পদত্যাগ, দপ্তর সংক্রান্ত কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নয়। অথচ শ্রীসিং বোফর্স নিয়ে বিতর্কের শুরুতে সরকার পক্ষ সমর্থনে বড় ধরনের ভূমিকাই নিয়েছিলেন। আকস্মিকভাবে রাজীবকে সমর্থন করার ভূমিকা থেকে সরে গেলেন কেন?

শ্রীসিং-এর ঘনিষ্ঠ জনেরা ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের মতে, প্রতিরক্ষা দপ্তরে বেশ কিছু অসঙ্গতি এবং নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার স্যাপার দেখে সত্য ঘটনা উদঘাটনে প্রধানমন্ত্রীর অনাগ্রহ আঁচ করেই শ্রীসিং পদত্যাগ করেছেন।

পরে জানা গিয়েছিল, প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টায় শ্রীসিং কামান বেচা কোম্পানিটিকে ভারতে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীসিং-এর আমন্ত্রণ বিদেশী কোম্পানি গ্রহণও করেছিল। কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা ভারতে যাবেন এমন সংবাদ ওরা জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হস্তক্ষেপ করলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। অথচ শ্রীসিং নাকি প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়েই বোফর্স কর্তাদের আমন্ত্রণ পাঠান। শ্রীসিং প্রধানমন্ত্রীকে এড়িয়ে এত-বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি।

আমন্ত্রণ পাঠানো ও গ্রহণের পর ব্যাপারটি যখন চূড়ান্ত রূপ নিতে চলেছে, কেবল সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ স্থির করা বাকি এমন এক মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদে উত্থাপন করলেন, পাঁচ-ই জুলাই ১৯৮৭। মন্ত্রীপরিষদ শ্রীসিং-এর উদ্যোগ নামঞ্জুর করে দেয়। শ্রীসিং পদত্যাগ করলেন।

*　　*　　*

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে বোফর্সের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপ নেয়। তার দু'মাস আগে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে ভারত ঘুরে গেছেন। কিন্তু ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার একমাস বাদেই তিনি বিস্ময়করভাবে নিহত হলেন। এই চুক্তি সম্পাদনে পালমের আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড রকমের।

বিশাল টাকার অঙ্কে এই চুক্তি সুইডেনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অনুকূল হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল। মজার ব্যাপার, ভারতের কর্মসংস্থানের স্থিরতা নেই কিন্তু ভারতের টাকায় সুইডেনের মতো উন্নত দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। সুইডেনের

একাধিক সংস্থা বোফর্স কামানের বিভিন্ন সরঞ্জাম জুগিয়েছে—সবক'টি সংস্থা লাভবান হবে।

একটি কামান ও তার সরঞ্জাম বহনকারী দু'টি গাড়ি থাকে। সাবস্ক্যানিয়া নামের সংস্থা এই গাড়ি নির্মাণ করে।

ঘটনাস্থলের জন্য ক্যামোফ্লেজ নেট নির্মাণে রয়েছে অপর একটি সংস্থা।

দূরবর্তী নিশান লক্ষ্যস্থলে আনার সরঞ্জাম তৈরী করেছে আর একটি সংস্থা।

এফ. এফ. বি. এই সংক্ষিপ্ত নামের সংস্থা গোলা বারদ জোগায়। এ ছাড়াও রয়েছে ব্রিটেনের ও ইতালির একটি ক'রে সংস্থা।

সংবাদপত্র থেকে জানা যায় বোফর্স কোম্পানি ৪১০টি হাওইটজার কামান সরবরাহ করবে কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সামরিক পত্রিকা 'জেনস ডিফেন্স উইক্লি'-র মতে কামানের সংখ্যা আরো বেশি। তাদের মতে টাকার মূল্যে যে ১৭০৪ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে তাতে আরো বেশি সংখ্যক কামান সরবরাহ করার কথা।

বোফর্সের এক মুখপাত্রের উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—তাঁর বক্তব্যে রয়েছে ভারতকে সরবরাহ করা হবে মোট দেড় হাজার কামান। ৪১০টি কামান আসবে সুইডেন থেকে। বাকী কামান তৈরী হবে এদেশে কোম্পানির লাইসেন্স কিনে নিয়ে—এখানে দু'টি কারখানায় কাজ চলবে।

বোফর্স কামান তৈরীর লাইসেন্স ভারত কিনে নিতে চায় এমন মর্মে সিদ্ধান্তের কথা প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী শিবরাজ পাতিল ২৪ এপ্রিল ১৯৮৭ লোকসভায় জানিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই চুক্তি নিয়ে বিতর্কের উত্তরে ভারত সরকার বার বার জানিয়েছেন যে, গোপন করার কিছু নেই চুক্তির মধ্যে—অন্যায্য কিছু ঘটে নি। সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণা ভারত-রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চুরমার ক'রে দেবার বিদেশী চক্রান্ত।

অথচ সুইডিশ রেডিও প্রতি ঘোষণাতেই জানিয়েছে, অভিযোগ

প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্যসাবুদ তাদের কাছে রয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই সব তথ্যাদি পরীক্ষা ক'রে দেখার মতো উপযুক্ত সাহস রাজীবের সরকার অর্জন করে নিতে পারে নি। এমন কি, সুইডিশ সরকারকেও ওইসব তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই ক'রে দেখার অনুরোধও ভারত জানায় নি।

সুইডেন ভারতের শত্রু দেশ নয়—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃত। দুই দেশেই যাতায়াত রয়েছে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর। সুইডিশ রেডিও-র তথাকথিত ভারত বিরোধী ঘোষণার পরেও দু'দেশের প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায় নি। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত কৌতুককর ব্যাপার হলো ভারত সরকারের ঘোষণা, যাতে বলা হ'য়েছিল, এই সব মিথ্যা সংবাদ ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করার চেষ্টামাত্র।

সুইডিশ জাতীয় রেডিও থেকে ঘোষণায় ঘুষ নেওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে যাওয়ার পরেই প্রকাশ পেল সুইডেনের জাতীয় অডিট ব্যুরোর প্রতিবেদন।

> সেই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হয়েছে বোফর্স কোম্পানি ফালতু টাকা ছড়িয়েছে—কোম্পানির চুক্তির মধ্যেই দালালি দেওয়ার সংবাদ স্বীকৃত হয়েছে। যাদের সঙ্গে বোফর্সের দালালি ব্যাপারটির চুক্তি হয়েছে রিপোর্টের সেই অংশটুকুই কেবল মুছে দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় রিপোর্টের এই অংশে নামগুলি মুছে দেওয়া হয়েছে।[৭]

এই রিপোর্টেই ঘোষিত হয়েছে ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে তিনটি কিস্তিতে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ক্রোনার (সুইডিশ মুদ্রা)

> ....that an agreement exists between A. B. Bofors and.........(মুছে দেওয়া অংশ).........concerning the settlement of commission subsequently to the FH 77 deal and that considerable amounts have been paid to among others, A. B. Bofors' previous agent in India."

অর্থাৎ ভারতের টাকায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থ কিস্তিতে ২৫ লক্ষ ক্রোনার বা ৫০ লক্ষ টাকা ডিসেম্বর মাসে দেওয়া হয়েছে।

দালালি সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা সুইডিশ রেডিও-র। দ্বিতীয় ঘোষণা, আরো বিস্তারিতভাবে সুইডিশ জাতীয় অডিট ব্যুরোর।

ভারতের বন্ধুদেশ সুইডেনের দুটি জাতীয় সংস্থা থেকে একই ঘোষণা ভারত সরকারকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। বোফর্স কোম্পানিও অস্বীকারের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসে নি।

এরপরে সুইডেনের খবর থেকে জানা যায় অডিট ব্যুরোর বোফর্স সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, এমন কি টুকরো-টাকরা হাতচিটা, মন্তব্য সম্বলিত ছেঁড়া কাগজের টুকরো সুইডিশ সরকার জাতীয় অডিট ব্যুরোর অফিস থেকে খুঁজে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছে। অডিট ব্যুরোর রিপোর্টে যেমন বোফর্সের দালাল কোম্পানির নামগুলি অবলুপ্ত তেমনি ব্যুরোর অফিস থেকে রিপোর্ট রচনার উপযোগী যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ নথীপত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অথচ সুইডিশ সরকার কোনো তদন্তে নেমে পড়েছেন, তাও নয়। এসব ঘটনা থেকে একটা সিদ্ধান্তেই কেবল আসা যায়, সুইডেনের সরকার চান না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হোক—যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ এখন তাঁদের হেফাজতে।

সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণা, তারপর অডিট ব্যুরোর প্রতিবেদন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চরম বিপদের মধ্যে ফেললেও মূল ঘটনাটি বারে বারে অস্বীকার করে গেছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে এমন সময়ে যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি একটি সপ্তাহে পাঁচবার বৈঠকে বসলো। প্রধানমন্ত্রীর আবাসে গভীর রাত পর্যন্ত তিনটি গোপন বৈঠক বসে সরকারি উপদেষ্টাদের নিয়ে। পরিত্রাণ খোঁজার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

ইতিমধ্যে বোফর্স কামানের গুণাগুণ সম্পর্কিত অত্যন্ত প্রতিকূল রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেল। শোনা গেল একটি পরীক্ষামূলক ঘটনায় কামানের গোলা বিস্ফোরণ নিম্নমানের। চুক্তিতে ছিল কামানের গোলার দৌড় ৩০ কিলোমিটার হবে। কিন্তু রাজস্থানের পরীক্ষাক্ষেত্রে কামানের গোলা ২১ কিলোমিটার দূরত্ব পেরোতে পারে নি। ১৯৮৭ মার্চে আর একটি ট্রায়াল নেওয়া হয়। সুইডেন থেকে বোফর্স কর্তারা এলেন—দ্বিতীয় ট্রায়ালেও জানা গেছে পরীক্ষাত্তীর্ণ হয়নি বোফর্স কামান।

প্রায় একই সময়ে সুইডেনে নতুন ঘটনার জন্ম হ'ল যার ফলে সুইডেনে বোফর্স কোম্পানির ভাবমূর্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি প্রয়াত সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমে সমালোচনার মুখে পড়লেন। তাঁর আমলেই ঘটলো সুইডেন থেকে চুপিসাড়ে যুদ্ধরত ইরাণে বোফর্স কোম্পানির যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণ। ইরাণ-ইরাক দুই দেশ যুদ্ধরত। সুইডেনের কানুন হলো যুদ্ধরত কোনো দেশে যুদ্ধাস্ত্র প্রেরিত হবে না! বোফর্স কোম্পানির চোরাচালান আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে যায়।

* * *

কামান বেচার ব্যাপারে বোফর্স কোম্পানির সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ কৌতূহলময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ঘটনাচক্র স্বাভাবিক পথে যায়নি বলেই গত বছরে ভারতীয় সংসদের অধিবেশনগুলিতে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। সরকার শেষ পর্যন্ত সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন বটে, বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা যোগ দেননি বিচার্য বিষয়ের বিতর্কে—তাতে ধরেই নেওয়া হয়েছে, সত্য উদ্ঘাটন হবে না।

এই সূত্রে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার জাল থেকে বোফর্স-ভারত চুক্তির ইতিহাস উদ্ধার করা যায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য ১৫৫ কিলোমিটার ফিল্ড গান কেনার জন্য চেষ্টা শুরু হয় ১৯৭৯ সালে যখন চরণ সিং ছিলেন

প্রধানমন্ত্রী। তার পরে ছ'বছরের বেশি সময় লেগে গেল সঠিক কামান বাছাই করতে। ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগে বিশেষ একটি যুদ্ধাস্ত্র সরঞ্জাম কেনার জন্য এত দীর্ঘ সময় কখনো লাগে নি।

মার্চ ১৯৮৬ সালে বোফর্স কোম্পানির সঙ্গে ১৭০০ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। অথচ ১৯৮০-৮২ সালের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কামানগুলির পরীক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, তার পরেও সিদ্ধান্ত নিতে এই বিলম্ব অযৌক্তিক বলে মনে হ'লেও যথাযথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণ রয়েছে।

কোন্ কামান উপযুক্ত, কোন্ কামান পরীক্ষাত্তীর্ণ হয়নি, কোন্ কামানের দাম বেশি—এসব খতিয়ে দেখে প্রতিরক্ষা বিভাগের টেকনিক্যাল কমিটি অনেক আগেই তাদের রিপোর্ট পেশ করে দিয়েছিল চুক্তি সম্পাদনের অন্তত চার বছর আগে। পরবর্তী চার বছরে চ'লছিল টানাপোড়েন কী ভাবে বিশেষ একটি কামানকে পছন্দের তালিকায় সবার শীর্ষে স্হান দেওয়া যায় তার চেষ্টায়।

ঘটনার শুরু ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে। জেনারেল ও পি. মালহোত্র তখন চীফ আর্মিস্টাফ। দূরপাল্লার কামানের জন্য তিনি তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যমকে প্রয়োজনের কথা জানালেন। দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগে কামান বাছাই করার জন্য একটি কমিটি তৈরী হ'ল। তাঁরা ১৫৫ মিলিমিটার হাওইটজার কামানের দাবি জানালেন।

১৯৮০ সালের আগষ্ট মাসে ওই জাতীয় কামান কেনার সিদ্ধান্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ ছ'টি দেশ ওই জাতীয় কামান নির্মাণ করে থাকে। মার্কিন দূর-পাল্লার কামান পেয়েছে পাকিস্তান—অতএব ভারতের পক্ষে মার্কিন কামান কেনা সঙ্গত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ হয়নি। চারটি দেশের সংস্হা এগিয়ে এলো কামান নিয়ে সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বিভাগের একাধিক টেকনিক্যাল কমিটি এবং সেনা-বাহিনীর প্রধানেরা যে সব কামান পছন্দের কোঠায় রেখেছিলেন

বোফর্স তাদের অন্যতম ছিল না। তালিকায় প্রথমে ছিল ফরাসী কামান, টি-আর-৫৫। দ্বিতীয় স্থানে অষ্ট্রীয় কামান জি-এইচ-এন-৪৫। তার পরেই বোফর্স কামান।[৫]

বোফর্স কামান সম্পর্কে জানা যায় ভারতে প্রথম চোটে পরীক্ষায় (জুন ১৯৮১) এই কামানের গোলার দৌড় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিল[৬]—পরে অবশ্য কিছু উন্নতি ঘটে। এবারে বোফর্স কোম্পানি আরেক ধরনের বিস্ফোরক গোলা আমদানি করে। এবারে গোলা ছুটলো ২১ কিলোমিটার পর্যন্ত।[৭] ভারতের প্রয়োজন কম ক'রে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব।

পরবর্তী জানুয়ারী মাসে (১৯৮২) ফরাসী কামান ২৯ কিলোমিটার দূরে গোলা ফাটায়। এই কামান থেকে ১৫ সেকেন্ডে তিনটি গোলা বিস্ফোরিত হতে পারে।

এই পরীক্ষা যখন চলছে লে. জে কৃষ্ণস্বামী সুন্দরজী ব্রিটেন, সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স ঘুরে ওই সব দেশের কামানের তথ্য সংগ্রহ করে আনলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে তিনি তাঁর পছন্দের কথাটিও জানিয়ে দিলেন পর পর এইভাবে সাজিয়ে—ফরাসী, সুইডিশ এবং ব্রিটিশ।

এটি সেনাদপ্তর থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে জানানো প্রথম সিদ্ধান্ত। কারণ এই সিদ্ধান্ত সুন্দরজীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসারেরা একসঙ্গে বৈঠকে বসেই দীর্ঘ সময় নিয়ে ফলাফল বিচার করে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন।[৮]

এর পরেও কিন্তু পরবর্তী প্রতিরক্ষা সচিব ভেঙ্কটরমণ উচ্চ-পদস্থ কর্মচারিদের নিয়ে আবার ওই দেশগুলি ঘুরে এলেন ব'লে শোনা গেছে। তাঁরা যে সব তথ্য নিয়ে এলেন সেগুলি বিচার বিবেচনার জন্য একাধিক কমিটি তৈরী হ'ল। শেষতম চূড়ান্ত

৫. ইন্ডিয়া টু-ডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. তদেব।

বিচারটি ক'রেছিল লে. জে. মায়া দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটি।

লে জে. দাস ছিলেন যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সংক্রান্ত বিভাগের ডিরেক্টর। জানা যায় ১৫ জন সদস্য ছিল মায়া দাসের কমিটিতে। বোফর্স কামান সম্পর্কে এই কমিটি অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য লিখে রাখেন।[৯]

কমিটির রিপোর্টটি সযত্নে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সংসদীয় বোফর্স তদন্ত কমিটির সামনে লে. জে. দাসের রিপোর্ট এবং লে. জে. দাসকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির করাতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-সহ বারোজন সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে পত্র দিয়েছিলেন। সংসদীয় তদন্ত কমিটি এখনো লে. জে. দাসকে সাক্ষ্য দানের জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি।[১০]

বোফর্স কামানের ব্যাপারে প্রথম বাধা ছিল এর দাম। সব কামানের থেকে দামটি বেশি। পরে কোম্পানি কামানের দাম প্রায় বিস্ময়কর ভাবে এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেয়। তাছাড়াও কামানের প্রাথমিক পরীক্ষায় গোলার দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটার ছিল না। তবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল কামান পছন্দ হ'লে তিরিশ কিলো-মিটার দূরে গোলা পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

ব্রিটিশ কামানের সঙ্গে জার্মানি ও ইতালি দেশ যুক্ত। এই কামানের দামও বেশি এবং গোলার দূরত্ব চব্বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত যায়।

সবচেয়ে ভারী হ'ল অষ্ট্রীয় কামান। কামানের নলও সবার চেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে এর গোলা —৩৯ কিলোমিটার পর্যন্ত। দামও বেশি নয়।

ফরাসী কামানের রেন্জ ২৯ কিলোমিটার পর্যন্ত যায় কিন্তু এর ক্ষমতা ৩২ কিলোমিটার ছাপিয়ে যাবে ব'লে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। দাম সবার চেয়ে সস্তা।

---

৯. ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

১০. তদেব।

এই সব তথ্য মায়া দাসের কমিটির রিপোর্টেই লেখা হ'য়েছিল। তথ্যগুলি সংগ্রহ করে, বিশ্লেষণ করে সেনা বিভাগের উচ্চতম ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের মতামত সংগ্রহ করে রাখা হয় লে. জে. দাসের কমিটি রিপোর্টে।

কমিটির উচ্চপদের সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন,

১. যুদ্ধাস্ত্র সরঞ্জামের ডেপুটি ডিরেক্টর,

২ আর্টিলারী ডাইরেক্টরেট-এর অন্য এক ভারপ্রাপ্ত অফিসার,

৩. সামরিক কারখানাগুলির ডিরেক্টর জেনারেল,

৪. যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর।

এঁদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই অষ্ট্রীয় কামান সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় সুপারিশে ছিল ফরাসী কামান।[১১]

একটা বিস্তারিত রিপোর্ট মায়া দাসের কমিটি থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু অভিযোগ, রহস্যময় কারণে রিপোর্টটি দিনের আলোয় আসেনি। সেনা বিভাগ থেকে রিপোর্ট সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি যদিও সরকারিভাবে এটিকে পরিত্যক্ত রিপোর্ট ব'লে ঘোষণা করাও হয়নি।

মায়া দাস কমিটির রিপোর্ট পেশের আগেই কিন্তু সেনা বিভাগের বড় কর্তারা ফরাসী কামানকে প্রথম পছন্দে রেখেছিলেন। দেখা গেল প্রতিদ্বান্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। ফরাসী কামান বনাম অস্ট্রীয় কামান। পরে অস্ট্রীয় কামানে একটাই দোষ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল—এই কামান মিনিটে পাঁচটি গোলা ফাটায়—ফরাসী কামান ছ'টি।

তৎকালীন সেনা বিভাগের প্রধান জেনারেল এ. এস. বৈদ্য ফরাসী কামান প্রথম পছন্দে রাখলেন। দ্বিতীয় ছিল বোফর্স।

সুন্দরজীর সময়কার তাঁর ডেপুটি ছিলেন লে. জে. কাউল—তিনিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত জানালেন।

এর পর জেনারেল বৈদ্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে

১১. ইন্ডিয়া-টু-ডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

ফরাসী কামানের শ্রেষ্ঠতা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন।[১২] পত্র পাঠাবার কারণ, শ্রীগান্ধী ব্রিটিশ কামান সম্পর্কে বিশেষ গুণাগুণ-গুলি জানতে চেয়েছিলেন। জেনারেল বৈদ্য তখন সব ক'টি কামানের গুণাগুণ বিবেচনা করে তাঁর পছন্দের কথা জানিয়ে দেন।

কিন্তু এর পর আশ্চর্যজনক ঘটনা, মায়া দাস কমিটির রিপোর্টটি আলমারী বন্দী ক'রে রাখা হ'ল।[১৩] অথচ সেনা বিভাগের কুশলী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ ও মতামত নিয়ে এই রিপোর্ট তৈরী হয়। লে. জে. দাসের কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপিত হবার পর কুড়িটি মাস কেটেছে। এই সময়ের মধ্যেই ক্ষমতাবান লবি যা করার করে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে দিল্লী এলেন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী। তারপর দুটি মাস কেটে যাওয়ার আগেই বোফর্সের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি। মাঝখানে ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৮৬) লে. জে. সোমান্না বোফর্স কামানের পক্ষে তাঁর মতামত দিয়ে রেখেছিলেন—তার এক মাস আগে এসেছিলেন সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী। ইনি আসার পরেই ওই রিপোর্ট।

আরো মজার ব্যাপার হ'ল, জেনারেল সুন্দরজী যিনি এর আগে দুবার ফরাসী কামানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, এবারে তিনি সেনা বিভাগের সর্বোচ্চ পদ লাভ করার পর বোফর্স কামানের পক্ষে সুপারিশ করলেন।[১৪]

এই ঘটনার তিন সপ্তাহ বাদে বোফর্স কামান কেনার চুক্তি সাঙ্গ হয়। সবচেয়ে মজার খবরটি পরে জানা গিয়েছিল, বোফর্স কোম্পানির যে মডেল কামান ভারত কিনেছে এটি সুইডেন নিজের ব্যবহারের জন্যেও পছন্দ করেনি।[১৫]

জানা যায়, বোফর্স কোম্পানী শেষ পর্যন্ত দামটি ফরাসী

১২. ইন্ডিয়া টু-ডে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব।

১৫. প্রোব, ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

কামানের থেকে কমিয়ে দেয়। বোফর্সের প্রথম দামটি ঘোষিত হ'য়েছিল ১৯০০ কোটি টাকা পরে ৫০০ কোটি টাকা কমিয়ে দাম রাখা হল যদিও ওই দামে শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয়নি। ওই দামটি ১৪০০ কোটি টাকা রাখার অর্থ ছিল ফরাসী কামানের থেকে দাম ৩০ কোটি কম থাকবে।

* * *

দাম কমানোর সঙ্গে আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্র নির্মাতা বোফর্স কোম্পানি ভারতীয় পণ্য নিয়ে বহির্বাণিজ্যে অংশ নেবে। কোম্পানি কামানের দামটি সরাসরি বিদেশী মুদ্রায় বা ভারতীয় টাকায় না নিয়ে বহির্বাণিজ্য মারফৎ সংগ্রহ করে নেবে। এই নিয়ে সন্দেহ হ'ল, একটি অপকর্ম সামাল দিতে আরেকটি অপকর্ম।

বিদেশে বাণিজ্যের জন্য ভারত থেকে বোফর্স কোম্পানি সংগ্রহ করবে কৃষিজ পণ্য, খনিজ ধাতু এবং শিল্পজাত পণ্য। আগামী দশ বছর ধরে পণ্য নিয়ে বাণিজ্য ক'রে টাকা তুলে নেবে। টাকার মূল্যে বাণিজ্যের আর্থিক পরিমাণ হবে ৮০০ কোটি টাকা। আসল রহস্য এখানেই।

লোকসভায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ হৈচৈ হ'য়ে গেছে ১৯৮৭ সালের নভেম্বরের গোড়ায়। আকস্মিকভাবে লোকসভার এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে জানানো হয় ব্যাপারটি।

বোফর্স কোম্পানির সঙ্গে কামান নিয়ে যে চুক্তি হয়েছে তার দামের কিছুটা শোধ হবে ভারতীয় পণ্য দিয়ে। বোফর্স কোম্পানি নিজে থেকে দায়িত্ব নিয়ে দেশে বিদেশে ভারতীয় পণ্য বেচে কামানের দামটি তুলে নেবে—এই ঘটনা খুব সহজ সরল ব্যাপার বলে লোকসভার সদস্যরা মনে ক'রছেন না। কোনো রহস্য রয়েছে বলেই সন্দেহ উগ্রতর।

প্রথমত, বর্তমানে বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বিশেষ নেই। রপ্তানী বাজারে ভারত ক্রমাগত মার খেয়ে যাচ্ছে

বলেই বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়ছে। যে পরিমাণ বিদেশী পণ্য ভারত আমদানি করে সেই পরিমাণে ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে কাটছে না। ভারতীয় পণ্যের এমন চাহিদার অভাব থাকা সত্ত্বেও বোফর্স কোম্পানির এই আগ্রহ সঙ্গত কারণেই সন্দেহের উদ্রেক করে।

সন্দেহ হ'ল, তাহ'লে কি অনেক কম দামে বোফর্স কোম্পানিকে ভারতীয় পণ্য ছাড়া হবে? বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার অন্যতম শর্ত এটি। লোকসান দিয়ে পণ্য ছাড়তে হবে, লোকসানের দায় বহন করবে কে? সরকারকে ঘর থেকে বেশি পরিমাণে ভরতুকি জোগাতে হবে—বহির্বাণিজ্যে যা হ'য়ে থাকে।

এই ভরতুকির টাকা কে পাবে? ভারতীয় পণ্য প্রস্তুতকারক না বোফর্স কোম্পানি? নিঃসন্দেহে বোফর্স কোম্পানি। কারণ, বিদেশে পণ্য বিক্রির ঝঞ্ঝাট তাকেই নিতে হবে। সঠিক দামে ভারত থেকে পণ্য কিনে কম দামে বিদেশের বাজারে ছাড়তে হবে ব'লেই লোকসান পুষিয়ে দিতে হবে ভারত সরকারকে। কিন্তু এই কি সব?

ভারত থেকে বোফর্স কোম্পানি কিনবে কৃষিজ পণ্য, খনিজ ধাতু ও শিল্পজ পণ্য। এমন সব পণ্য দিয়ে দাম শোধ হবে যেগুলি সুইডেনের কোনো কাজে লাগবে না। এই প্রশ্ন তুলে লোকসভার বিরোধী পক্ষীয় সদস্যরা মনে করেন, এমন আশ্চর্য চুক্তির রহস্যটি মোটেই সহজ সরল নয়। আসলে বিশাল পরিমাণ উৎকোচ ও দালালির ব্যবস্থা ক'রে কামান কেনার অপকর্মটি সামাল দিতে গিয়ে তথাকথিত বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্য নিতে হ'ল।

এই অপকর্মের জটিল ব্যাপারটিও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। সন্দেহের স্তরেই রয়েছে ব্যাপারটি। তবে অনুমান থেকে ঘটনা যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো, বোফর্স কোম্পানি কামানের দাম প্রথম চোটে ১৯০০ টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে এনেছিল দামের প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য।

কিন্তু কোম্পানির ইচ্ছায় কমিয়ে দেওয়া দামে কামান কেনাবেচার চুক্তি হয় নি। প্রথম দাম নিয়ে চুক্তির কথা হ'ল ১৪০০ কোটি টাকায়। ফরাসী কামানের দাম ১৪৫০ কোটি টাকা। বোফর্স কামানের দাম ৫০ কোটি টাকা কম রইলো।

ঠিক এই সময়ে নাকি দালালের আবির্ভাব ঘটলো। তারাই বোফর্স কোম্পানিকে জানিয়েছিল কোম্পানির কমিয়ে দেওয়া দাম হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০০ কোটিতে তুলে আনুক। তাতে অসুবিধে হবে না। ফরাসী কামানের থেকে দাম কমই থাকবে। তবে খাতায় কলমে ১৪০০ কোটি লেখা হবে কিন্তু বোফর্স পাবে হাজার কোটি টাকাই। এক হাজার কোটি টাকা নিয়ে পুরো দামের ১৪০০ কোটি টাকা শোধ হ'ল বলে রসিদ দিতে হবে।

এসব শুনে বোফর্স কোম্পানিও সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তারা নাকি তখন জানায় দাম আরো দু'শো কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হোক—কেননা কামানের রেন্জ ৩০ কিলোমিটারে নিয়ে আসতে কিছু বাড়তি খরচ হবে। কোম্পানি যাতে মোট বারোশো কোটি টাকা পায় সে ব্যবস্থা হোক। পণ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা মিলিয়ে বারোশো কোটি পেলে ১৬০০ কোটি টাকার রসিদ লিখে দিতে অসুবিধে হবে না। পরে এটি ১৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় কীভাবে জানা নেই।

এখানেই এল দালালের সক্রিয় ভূমিকা আর হিসেবের কারচুপির ব্যাপার। বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্য নিয়ে কারচুপি। ঠিক হ'ল বারোশো কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বোফর্স কোম্পানিকে দেওয়া হবে, কিন্তু হিসেবের খাতায় থাকবে ৮০০ কোটি টাকা। কামানের দরুণ দামের বাকী টাকা বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হবে। ওই পরিমাণটি সম্ভবত ৯০০ কোটি টাকা। পণ্যের দরুণ বাড়তি টাকা (১২০০ – ৮০০ = ৪০০) জমা হবে বিদেশের ব্যাঙ্কে, অর্থাৎ সুইস ব্যাঙ্কে একাধিক দালালের নামে।

বাড়তি টাকা এখন চারশো কোটি হিসেবে দেখা গেলেও এটি

শেষ পর্যন্ত চারশো কোটি নাও থাকতে পারে এমন দুশ্চিন্তা ভারত ও বোফর্স দুপক্ষের-ই রয়েছে। বাজারে কাটাবার জন্য ১২০০ কোটি টাকার পণ্য হাজার কোটি টাকায় ছেড়ে দিতে হ'তে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত ফালতু টাকার পরিমাণটি দু'শো কোটি বলেই ধরা হয়েছে কেননা বাণিজ্য চলবে দীর্ঘকাল—দশটি বছর। তবেই পুরো টাকা শোধ হবে।

এই সব কারচুপি ক'রতে হলে হিসেবের খাতায় বিস্তর হেরফের ঘটাতে হয়। অনেক ঝক্কি রয়েছে বৈকি! তাই বোফর্স কোম্পানিকে আরো লোভনীয় প্রস্তাবের ফাঁদে ফেলা হ'ল। আরও দু'হাজার কোটি টাকার চুক্তির ফাঁদ।

সুইডেন থেকে ৪১০টি বোফর্স কামান সরবরাহ নেওয়ার পর ওই কামান যাতে ভারতে তৈরী হ'তে পারে তার রয়াল্টি, লাইসেন্স ও কারিগরি সহযোগিতার দরুণ বোফর্সকে দেওয়া হবে আরো দু'হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবে বোফর্স কোম্পানিও রাজি হয়ে যায়।

১৯৮৭ সালের এপ্রিলে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে বোফর্সের ব্যবসায়িক চুক্তিটি হয়েছে। আর ওই এপ্রিলেই শোনা গেছে সুইডিশ রেডিও-র ঘোষণা ঃ সুইস ব্যাঙ্কে গোপন একাউন্টে বোফর্স কোম্পানির পক্ষ থেকে টাকা জমা দেওয়ার ঘটনা।

গত এপ্রিলেই (১৯৮৭) লোকসভায় মাননীয় সদস্য কে পি উন্নিকৃষ্ণন প্রশ্নটি তুলেছিলেন, বোফর্সের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে কিনা। তখন জবাব মেলেনি। সেটি ছিল বাজেট সেসন। দীর্ঘ সময় কাটিয়ে পরবর্তী শীতকালীন অধিবেশনে সরকারি উত্তর শোনা গেল, 'হ্যাঁ হয়েছে'।

বোফর্স কেলেঙ্কারী ভারতের বহির্বাণিজ্যেও ঢুকে গেল। এক কেলেঙ্কারী চাপতে আর এক কেলেঙ্কারী।

*　　*　　*

১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে ভারতে বোফর্স কোম্পানির

প্রতিনিধিদের আগমন সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল ঃ ওঁরা এলে কাজের কাজ কিছু হবে না—খোলাখুলি কিছুই ওরা বলবেন না। যারা কিছু বলতে চায় না তাদের সঙ্গে কথা বলে কী লাভ।[১৬]

জুলাই মাসের এই ঘটনা। প্রধানমন্ত্রীর আচরণ মন্ত্রী অরুণ সিংকে বিক্ষুব্ধ ক'রে বলেই জানা গেছে। শ্রীসিং পদত্যাগ করেছিলেন। শ্রীসিং-এর মুখ বন্ধ করা সম্ভব হ'য়েছিল বটে কিন্তু দেশজুড়ে তুমুল হৈচৈ রোখা যায় নি।

সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ জানা গেল বোফর্সের দুই কর্তাব্যক্তি দিল্লী আসছেন, বোফর্স কোম্পানির প্রেসিডেন্ট পার ওভ মোরবার্গ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট লারস্ গথলিন। ভারতে থাকবেন ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর। এঁরা এলেন, ভারতে এসে জল ঘোলা করে দেশে ফিরে গেলেন।

কেউ জানে না হঠাৎ বোফর্সের দুই কর্তা কেন দিল্লী হাজির হলেন। কেন এসেছিলেন, কার আমন্ত্রণে এসেছিলেন, তা অজ্ঞাত। তবে জুলাই মাসে তাদের আগমন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ সিং। এখন জল ঘোলা করতেই যে আসা এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই—কারণ ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার এক ইংরাজী সংবাদপত্রে[১৭] বোফর্স কোম্পানির ডিরেক্টর সভার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত জানা যায়—তাদের বক্তব্য হ'ল ঘুষটুস কিছুই দেওয়া হয়নি। তদন্ত করার দরকার হ'লে সেটি ভারত সরকারের দায়িত্ব।

সুইডেনের বিদেশমন্ত্রী স্ট্যান অ্যানডারসন জানালেন, 'বোফর্স কোম্পানি যদি কোনো কিছু প্রকাশ করতে রাজি না থাকে তাহলে সুইডিশ সরকারের করণীয় কিছু নেই।'

---

১৬. Nothing would have been gained from it because Bofors is not prepared to reveal anything and there is no use talking to people who just do not want to talk. (PROBE—December 1987)

১৭. দ্য স্টেটসম্যান, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

মন্তব্যটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সুইডিশ সরকার সত্যি কী করতে পারে বা না পারে আমাদের জানা নেই। সরকারের কত কী ক্ষমতা সেটি সুইডিশ সরকারই জানেন কিন্তু সুইডিশ রেডিও বা সুইডিশ জাতীয় অডিট ব্যুরো যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তা শেষ পর্যন্ত চমকপ্রদই রইলো, কাজের কাজ কিছু হ'ল না। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ঘটনাও স্মরণীয় যে, সুইডিশ সরকার বোফর্স সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র জাতীয় অডিট ব্যুরোর অফিস থেকে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে। বোফর্স সংক্রান্ত কাগজগুলি সুইডিশ সরকারের কী প্রয়োজন ছিল—এর উত্তর কে দেবে ?

তবে লক্ষ্য করার ছিল বোফর্স কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের আগমন সম্ভাবনার সংবাদ ঘোষিত হ'তেই দিল্লীর সরকারী মহলে বেশ সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। সংবাদপত্রের তখনকার খবরগুলির ওপর চোখ বোলালেই জানা যাবে দিল্লীর ওপর মহলে স্নায়ু দৌর্বল্যের সংবাদ। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর খরাপীড়িত এলাকায় জরুরী পরিদর্শনের কার্যক্রম বাতিল ক'রে দিলেন। দুই কর্তাব্যক্তি যতদিন দিল্লীতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানি থেকে নড়েননি, যদিও কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা যোগাযোগের কোনো ব্যাপারই ছিল না। **অথচ মাস দুই আগে এদের আগমন সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন।**

কোম্পানির প্রতিনিধিদের দিল্লী আসা সম্পর্কে একটা সাফাই অবশ্য ছিল, সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেওয়া। তাঁদের হয়তো ভয় ছিল একেবারে অসহযোগিতা প্রকাশ পেলে ফল সম্পূর্ণই বিপক্ষে যেতে পারে। প্রাথমিক চুক্তির পর অন্য চুক্তি নিয়ে যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে তা বাতিল হ'য়ে যেতে পারে—তার চেয়ে বরং সহযোগিতার অভিনয় ক'রে জল ঘোলা করাই সুবিধে। ব্যাপাটি ঘটলো সেই মতোই।

কোম্পানির দুই বড় কর্তা সংসদীয় তদন্ত কমিটির সামনে বোফর্সের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি কোম্পানিকে ভারতে কামান

সরবরাহের জন্য টাকা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, চুক্তি মতো এদের দালালি দেওয়া যাবে না ব'লেই কাজ কারবার গুটিয়ে নেওয়ার জন্য খেসারত দিতে হয়েছে—এই টাকা দেওয়া আসলে দালালি বন্ধের জন্য খেসারত।

তবে তদন্ত কমিটির কাছে কোম্পানিগুলির নাম প্রকাশ করতে দুই কর্তা অস্বীকার করেছেন। নামগুলি তাঁরা জানিয়েছেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের—কোনো লিখিত বিবৃতি নয়, মৌখিক। মুখে মুখে তিনটি বিদেশী কোম্পানির নাম টাকা প্রাপক সংস্থা হিসাবে জানানো হয়েছে। ভারত সরকারের কাছে এই ঘটনা আত্মসম্মানে মোটেই আঘাত দেয় নি—এটাই আশ্চর্য।

দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা, জনগণের নির্বাচিত সংসদীয় প্রতিনিধিদের কাছে কোনো তথ্য বা সংবাদ দেওয়া তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেই করেন নি। পরিবর্তে সরকারের বেতনভুক কর্মচারীদের সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বিদেশী অস্ত্র কারবারীদের এমন ঘৃণ্য আচরণ আমাদের দেশ ব'লেই কি সম্ভব হয়েছে? এরকম ঘটনা পশ্চিমের কোনো দেশে ঘটে গেলে সরকারের কী অবস্থা হ'তে পারে তা কোনো গবেষণার বিষয় নয় কিন্তু। এক ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীতে মার্কিনমুলুকে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ রোখা যায় নি।

সংসদীয় তদন্ত কমিটি যখন প্রশ্নটি সরাসরি রাখেন, বাড়তি টাকা কাদের দেওয়া হয়েছে? বোফর্স কর্তাব্যক্তিরা জবাব দিলেন—'এর কোনো জবাব দেব না।'

যদিও তাঁরা বলেছিলেন তাদের প্রদেয় টাকা কোনো উৎকোচ দেওয়া নয় তবু গোপনতা ভাঙতে তাঁরা রাজি নন। এ এক আশ্চর্য ব্যবসায়িক চুক্তি, উৎকোচ নয় অথচ বাড়তি টাকার প্রাপকদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা। তবে সরকারী পদস্থ কর্মচারীদের কাছে নামগুলি মৌখিকভাবে প্রকাশ করে তাঁরা জানালেন প্রদত্ত টাকার পরিমাণ কম নয়—পঞ্চাশ কোটি নয়, এমন কি ৩১৯ লক্ষ

সুইডিশ ক্রোনারও নয়। কামানের মোট দামের এগারো দশমিক পঁয়ত্রিশ শতাংশ, অর্থাৎ ৯০ কোটি ক্রোনারের ওপর, টাকার মূল্যে প্রায় দু'শো কোটি টাকা।

বোফর্সের এই স্বীকৃতি কেবল কোম্পানিকেই নয়, ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাও ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল।

ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্মেলন করার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেও বোফর্স কর্তারা সম্মেলন বাতিল করে দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁরা বাছাই করা কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু মূল সংবাদটি তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ সময়ে তাঁরা মুখটি বুজে থাকেন। অথবা কখনো 'কোনও মন্তব্য নয়' ব'লে প্রশ্ন এড়িয়ে যান।

এই চাপাচাপি পরিবেশের মধ্য দিয়েও যতটুকু তাঁরা প্রকাশ করেছেন তাতেও সন্দেহ আরো জটিল হ'য়েছে। কমিশন গ্রহীতা তিনটি কোম্পানির নাম তাঁরা সরকারের পদস্থ কর্মীদের কাছে প্রকাশ করলেও ওই কোম্পানিগুলির আড়ালে বা পেছনে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় কি অভারতীয়—সেই সন্দেহ কিন্তু রয়েই গেল। কোম্পানির আড়াল নিয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত-ভাবে ফালতু টাকা পেয়েও যেতে পারেন। সেই সন্দেহ তাঁরা দূর করেন নি।

সন্দেহ মূলতঃ আরো গাঢ় হবার কথা। কারণ ২৬ আগষ্ট ১৯৮৭, বোফর্সের পরিচালক কোম্পানি নোবেল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান লারস এরিক থুনহেলেম বলেছিলেন, 'যে সব কোম্পানিকে টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের পেছনে ভারতীয়-অভারতীয় দু'-রকম-ই আছেন।'

একই সংস্থার দুই কর্তার মুখ দিয়ে পরস্পর-বিরোধী সংবাদ প্রকাশ পেল।

তবে বোফর্স প্রতিনিধিদের উক্তি যথার্থ সত্য ব'লে মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। স্বদেশের আইনভঙ্গকারী কোম্পানিটি ভারত সরকারের কাছে সাদরে গৃহীত হ'লেও ব্যবসার

স্বার্থে নীতি বিসর্জন দিয়েছে, স্বদেশে এদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে অমিতাভ বচ্চনকে জড়িয়ে দু'টি সার্টিফিকেট দিয়েছেন বোফর্স কর্তারা—এঁরা কেউই উৎকোচ নেননি ব'লেই ঘোষণা করেছেন।

স্বদেশে চোরাচালানকারী ব'লে অভিযুক্ত এক সংস্থার সার্টিফিকেট ভারতের এক চিত্রাভিনেতা ও তার সঙ্গে জড়িত প্রধানমন্ত্রীর আত্মসম্মান কতখানি বাড়িয়ে দেবে প্রশ্ন সেটাই।

*   *   *

বোফর্স কোম্পানীর লুকোচুরি খেলায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে শেষ পর্যন্ত সুইডেনের সরকারী কৌঁসুলি লারস্ রিংবার্গ বোফর্স কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন ভারতের সংসদীয় তদন্ত কমিটি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ করবে। কারণ, দুটি কমিটির লক্ষ্য একটাই, উৎকোচ দেওয়া হয়েছে কিনা বা কারা কারা উৎকোচ পেয়েছে তাদের সন্ধান নেওয়া। কিন্তু সংবাদে জানা গেল[১৮] ভারতীয় সংসদের তদন্ত কমিটির (জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির) সভাপতি শ্রীশংকরানন্দ এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। ভারত সরকারের এই আচরণ অনেকের কাছেই এখন বিস্ময়কর ব'লে মনে হবে না।

এই তদন্ত শুরু করার আগে গত আগস্টে (১৯৮৭) রিংবার্গ বলেছিলেন, তিনি আশা করেন যে ভারত সরকার হয়তো সুইডেনে তদন্তের জন্য সুইডিশ সরকারকে অনুরোধ জানাবেন। তাঁর প্রাথমিক আশাটি যখন পূরণ হয়নি **তখন রিংবার্গের বোঝা উচিত ছিল ভারতে যে তদন্ত হচ্ছে সেটির প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য বার করা নয়। ঠক্কর-নটরাজন কমিটির রায় দেখেই এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়।**

অনেকেই মনে করছেন সংসদীয় তদন্ত কমিটি মূল প্রশ্নের

১৮. দ্য স্টেটসম্যান, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৮।

অনুসন্ধানের বদলে অন্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজে হাজির করবে, যেটি জানা একান্ত জরুরী নয়। এই কমিটি এখন তদন্ত করছে বোফর্স কামান সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল কিনা—এটা অন্যতম প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু মূল প্রশ্ন এটি নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই কমিটি এখনো সরকারের কাছ থেকে, বোফর্স-এর কাছ থেকে কমিশন প্রাপক অভারতীয় কোম্পানিগুলির নাম চেয়ে পাঠান নি।[১৯] আসলে যা দেখা দরকার তা হোল কোম্পানীগুলি কাদের, কি তাদের ব্যবসায়িক বিষয়, এদের সঙ্গে কারা জড়িত আছেন, এরাই বা বোফর্সের প্রদত্ত টাকা অন্য কাউকে দিয়েছেন কিনা, ভারত কামান কিনবে তার জন্য এই বিদেশী কোম্পানিগুলি ফালতু টাকা কেন পাবে ; এই ফালতু টাকা পাওয়ার পেছনে এসব কোম্পানির ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো ব্যক্তিবর্গ আছেন কি-না। এসব প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার দায় সংসদীয় তদন্ত কমিটির। যতদূর জানা গেছে এখন পর্যন্ত এই-সব সন্ধানের পথে তদন্ত কমিটি মোটেই এগোয়নি। বোফর্স কামান ভালো, কি খারাপ, এই বিচারটি চলেছে ডিসেম্বর জুড়ে।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো বিদেশী তিন কোম্প্যানির নাম জানার পর ভারত সরকার এই কোম্পানিগুলির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে এখনো শুরু করেনি বা তদন্ত কমিটির কাছেও স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে নামগুলি পাঠায়নি।[২০] স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বোফর্স কোম্পানীর কাছে গোপন সহযোগীদের অস্তিত্ব খুবই মূল্যবান বটে কিন্তু ভারতের টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে—যার পরিমাণ প্রায় দুশো কোটি টাকার মতো, তাদের পর্দার আড়ালে রাখার দায় ভারত সরকার নেবে কেন ? এইসব প্রশ্নের সদুত্তর কি সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাছ থেকে পাওয়া যাবে ?

এ পর্যন্ত তদন্তে নেমে জানুয়ারী, ১৯৮৮ পর্যন্ত সুইডেনের সরকারি কৌঁসুলি (পাবলিক প্রসিকিউটার) লারস রিংবার্গ বেশ

১৯. দ্য স্টেটসম্যান, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৮।

২০. তদেব।

কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন কিন্তু ভারত সরকারের অসহযোগিতায় তদন্ত মাঝপথে ঘা খেয়েছে—পরিষ্কার জানা যাচ্ছে না তিনি আর তদন্ত চালাবেন কিনা। তদন্তের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে তাঁকে বসে যেতে হচ্ছে—সুইজারল্যান্ডে ভারতীয় একাউন্ট সম্পর্কে তথ্যাদি এ-ব্যাপারে ভারত সরকারের সহযোগিতা না থাকলে প্রামাণিক সংবাদ জানা যাবে না।

রিংবার্গ যে সব তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন তার কিছু সংবাদ সুপরিচিত সাংবাদিক অরুণ শৌরি প্রকাশ করেছেন।[২] বোফর্স কোম্পানী ৬৩ কোটি টাকা তিন বিদেশী-কোম্পানির মাধ্যমে পাচার করেছে। এগুলি হল ঃ

১. পানামার স্ভেনেস্কো ইনকর্পোরেটেড,
২. লন্ডনের এ অ্যান্ড ই সার্ভিসেস, এবং
৩. সুইজারল্যান্ডের মোরেস্কো।

রিংবার্গের মতে তিনটি কোম্পানি-ই নাকি বেনামী কোম্পানি। 'স্ভেনেস্কো' কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক মাদক চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত।

এ অ্যান্ড ই সার্ভিসেস কোম্পানিটি লন্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত হলেও ইউরোপের কুখ্যাত চোরাচালানী টাকার কেন্দ্র লিকটেনস্টাইন রাষ্ট্রে রেজিস্ট্রিকৃত 'সিয়াও অ্যানস্টাল্ট' কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার সিয়াও নামের কোম্পানিটি ওই দেশেরই অপর একটি কোম্পানী 'সিডিস অ্যানস্টালট'-এর পরিচালনাধীন। 'অ্যানস্টাল্ট' কোম্পানীগুলি লিকটেনস্টাইনের বিশেষত্ব। এরা মূলতঃ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। এই ধরনের কোম্পানি ইউরোপ আমেরিকায় আর কোথাও নেই। এরা একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিগুলির আন্তর্জাতিক বাজার পরিচালনা করে।

মূলতঃ চোরাচালানী ব্যবসা, এক দেশের সীমানা পেরিয়ে অপর

২১. বর্তমান, ২৭ জানুয়ারী ১৯৮৮
৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

দেশে চালান করায় বা এক দেশের টাকা অপর দেশে চালান করায় বিশেষ ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার। সাংগঠনিক ভাবে এই দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়েছে 'অ্যানস্টালট' নামের কোম্পানিগুলি। এই হিসেবেই এই সংস্থাগুলি 'লিকটেনস্টাইন' রাষ্ট্রের বিশেষত্ব। এই রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে চোরাচালানি ব্যবসা বে-আইনি নয়। সারা বিশ্বে 'লিকটেনস্টাইন' এই ব্যাপারে অদ্বিতীয় রাষ্ট্র। চোরাচালানি অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের সেরা দেশ সুইজারল্যান্ডেরও বিরক্তির কারণ ঘটিয়ে থাকে এই 'লিকটেনস্টাইন' রাষ্ট্র।

এমন একটি রাষ্ট্রের রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার পরিচালনায় যে কোম্পানি থাকে সেই কোম্পানিকে কিসের কারণে বোফর্স কোম্পানি ভারতে কামান বেচার দরুণ ফালতু টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে? একই প্রশ্ন পানামায় ও লন্ডনে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থাদুটির ওপর বর্ষিত হতে পারে। পানামা দেশটি আবার দেশবিদেশের মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য পরিচিতি পেয়েছে। এদেশের ব্যাঙ্কগুলিতে যত সম্পদ সঞ্চিত আছে তার ৯০ শতাংশ হল বিদেশী টাকা।[২১] এই দেশেরই কোম্পানী 'স্ভেনেস্কো' বোফর্সের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। 'মোরেস্কো' কোম্পানি সম্পর্কে সংবাদ হল সুইডিশ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সূত্র থেকে এই কোম্পানির নামটি পাওয়া গেছে এবং এটি সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি বলেই ওই সূত্রে অভিহিত। তবে রিংবার্গ সুইস কোম্পানিগুলির সরকারি নামের তালিকায় 'মোরেস্কো'র নামটি পান নি।

এই কোম্পানীগুলির জন্য বোফর্সের প্রদত্ত টাকা, রিংবার্গের মতে ৬৪ কোটি টাকা একাধিক সুইস ব্যাঙ্কে বিভিন্ন সাংকেতিক (কোড) নামে জমা পড়েছে। কয়েকটি নামের তিনি উল্লেখ করেছেন 'সন্ট ব্র্যাঙ্ক,' 'টিউলিপ' ও 'লোটাস'। রিংবার্গ জেনেছেন কোম্পানির নাম, ব্যাঙ্কের নাম, একাউন্ট নম্বর, সাংকেতিক নাম, জমা দেওয়া টাকার পরিমাণ, জমা দেবার ব্যাপারে কী সব নির্দেশ

২১. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ওয়ার্ল্ড ডাটা- ১৯৮৬, পৃ. ২৯৩।

ছিল এ সব কিছুই জেনে নিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার একই সাংকেতিক একাউন্টে বিভিন্ন দেশের টাকায় জমা দেওয়া হয়েছে।

আরো বিস্ময়কর খবর হল কামান কেনার টাকা প্রাথমিক ব্যবস্থায় সুইডিশ সরকার ঋণ হিসেবে দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিমত বোফর্সের সরাসরি যোগাযোগ ঘটেছে—এই যোগাযোগের ব্যাপারে প্রথমে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর তৎপরতাই চুক্তি সম্পাদন সহজতর করে তুলেছে—তারপরেও তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন কেন হবে এর কোনো সদুত্তর বোফর্স কোম্পানি দিতে পারেনি! লারস রিংবার্গ প্রশ্ন করে কোম্পানির কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাননি। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত পালটে দিতে পারে এমন ব্যক্তিটি কে? আর টাকা দেওয়ার ব্যাপারে যদি অন্যায় কিছু না থাকে তাহলে গোপনতার আশ্রয় নেওয়া কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর রিংবার্গ পাননি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরে (১৯৮৭) যখন সুইডেনে গেলেন যুদ্ধবিরোধী ছয় দেশের সম্মেলনে যোগ দিতে তখন রিংবার্গ প্রধানমন্ত্রীর দলের যে কোনো একজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল যে সব তথ্য তিনি পেয়েছেন সেগুলি নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার সুযোগ করে নেওয়া এবং ভারতীয় তদন্ত কমিটিকে সাহায্য করা। আশ্চর্যের ব্যাপার রিংবার্গকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি।[২৩]

২৩। বর্তমান, অরুণ শৌরি।

ডুবন্ত সাবমেরিন

অর্থমন্ত্রক থেকে সরিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৮৭) বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হলো। ঠিক তার কিছুদিন বাদেই পশ্চিম জার্মানির এইচ ডি ডাব্লিউ সংস্থা থেকে আগত এক প্রতিনিধি এবং পশ্চিম জার্মানি সরকারের সচিব-পদে অধিষ্ঠিত পদস্থ এক কর্মচারী দিল্লীতে এলেন। এইচ ডি ডাব্লিউ সংস্থাটির পুরো নাম 'হাওয়াল্ডস্‌ভেকে ডয়েশে ভের্ফট'। এই সংস্থা ডুবোজাহাজ প্রস্তুতকারক। ১৯৮১ সালে ভারত এই সংস্থার কাছ থেকে ডুবোজাহাজ কিনেছিল। এবারে ভারত সরকার কিনবে আরো দুটি। সেই সুবাদে জার্মান সরকারের পদস্থ অফিসার ও কোম্পানির প্রতিনিধি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য এসেছিলেন।

বিশ্বনাথ প্রতাপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে যোগ দেওয়ার আগে রাজীব গান্ধী ছিলেন এই মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত। তাঁর সময় ডুবোজাহাজ কেনার চূড়ান্ত কথাবার্তা চলে আসছে। ঠিক হয়েছিল এবারে দু'টো সাবমেরিন কেনা হবে। আর দু'টো ওই কোম্পানির লাইসেন্স ও কারিগরি সহায়তা নিয়ে ভারতীয় কারিগর দিয়ে এদেশে তৈরী হবে।

দামের আলোচনায় এবারে কোম্পানি যে দামটি চেয়ে বসলো সেটি ১৯৮১ সালে একটি সাবমেরিনের যে দাম ছিল এবারে তার দ্বিগুণ। ভারত সরকার অনুরোধ জানালেন দামটি কমানো হোক। অনেক বেশি দাম চাওয়া হয়েছে। জার্মানি থেকে আগত প্রতিনিধিরা শুনলেন, জানালেন দেশে ফিরে আলোচনা ক'রে ফলাফল জানাবেন।

প্রতিনিধিরা জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার পর এইচ ডি ডাব্লিউ সংস্থা থেকে জানানো হলো কমিশন এজেন্ট বা দালাল গোষ্ঠীকে দামের সাত শতাংশ কমিশন দিতে হবে বলে দামটি বাড়িয়ে রাখা

হয়েছে। উত্তরটি এসেছিল পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পাঠানো টেলেকস্ বার্তা মারফৎ। উত্তরটি পেয়েই মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ তদন্তের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন—কেন এই দালালগোষ্ঠীর নিয়োগ ?

এর পরেও চমকপ্রদ খবর ভারতের মানুষের জন্য অপেক্ষায় ছিল—বোফর্স কামানের ঘটনা। তবে তদন্তের আদেশ দেওয়ার আগে বিশ্বনাথ প্রতাপ 'আই এন এস শিশুকুমার' নামে ঐ কোম্পানির বর্তমান তরফে প্রথম ডুবোজাহাজটি জলে ভাসিয়ে ভারতের কাজে চালু করার শুভ কর্মটি উদ্‌যাপন করেছিলেন। পরে জার্মানি থেকে আকস্মিক দুর্বিপাকের মত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী জে সি আজমানির টেলেক্স বার্তাটি এলো, সাবমেরিন কেনার দরুণ এক ভারতীয় দালাল ৩০ কোটি টাকা পেয়েছে। এই ঘটনা বিশ্বনাথ প্রতাপের তদন্তের সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর করে।

কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই এই তদন্ত হবে—আদেশটি প্রকাশ্যে দেওয়া হয়েছিল ১১ এপ্রিল ১৯৮৭। এর পরে একটা সপ্তাহ কেটে যাওয়ার আগেই সুইডেনের জাতীয় রেডিও সংস্থা থেকে ঘোষণা করা হল যে, বোফর্স কোম্পানি তাদের সবচেয়ে বড় চুক্তি-টি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে উৎকোচ বিলিয়ে—ভারতের ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের উৎকোচ দেওয়া হয়েছে।

পর পর দু'টি ব্যাপারে কমিশন এবং ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগে আপত্তিকর কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

* * *

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন কেনার কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৯৮০ সালে—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনর্বার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে। সাবমেরিন বিক্রির চেষ্টায়

ছ'টি দেশ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে—পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স, বৃটেন এবং ইতালি। পরে পছন্দের তালিকায় রইলো দুটি দেশের পণ্য, সুইডেনের কোকুম সাবমেরিন আর পশ্চিম জার্মানির এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানির সাবমেরিন। ভারতীয় নৌদপ্তর এবারে কোকুম সাবমেরিন চেয়েছিল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই সাবমেরিন ব্যবহার ক'রে থাকে।

সাবমেরিন কেনার প্রাথমিক কথাবার্তা শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার আগেই শুরু হয়েছিল জনতা সরকারের আমলে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি—শ্রীমতী গান্ধীর আমলেই সেটি নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মন্ত্রিসভার এক কমিটি কোকুম সাবমেরিনকে পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানে রেখেছিল। এই সিদ্ধান্তের বদল ঘটে যায় শ্রীমতী গান্ধীর আমলে। ১৯৮০ সালে ডুবোজাহাজ কেনার জন্য মন্ত্রিসভার নতুন শাখা সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতি কিন্তু দুটি দেশের সাবমেরিনকে পাশাপাশি পছন্দের তালিকায় স্থান দিলেন।[১]

এর পরে সিদ্ধান্তটি নিলেন মন্ত্রীপরিষদের রাজনৈতিক শাখা। ১৯৮০ সালে জুন মাসের শেষে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর এই সমিতির অধিবেশন বসে। এরাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জার্মান ডুবোজাহাজ কেনা হবে। তবে সিদ্ধান্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে আঠারো মাস কেটে যায়।

এই দীর্ঘ বিলম্বের দুটি কারণ জানা গেছে। প্রথমত, দামের ব্যাপারটি নিয়ে অনেক কথাবার্তা চালানো হয়, দাম কমানোর চেষ্টা হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ এড্মিরাল পেরেরা জার্মান সাবমেরিন পছন্দ করেন নি বলে জানিয়েছিলেন। অবশ্য দামের ব্যাপারে পার্থক্য ছিল। সুইডিশ ডুবোজাহাজের দামটি ছিল চল্লিশ কোটি টাকা বেশি। তবু সুইডিশ সাবমেরিন পছন্দের কারণ হলো, এর ইঞ্জিন তুলনায় সেরা বলে চিহ্নিত—জলের তলায় বেশি সময় কাটাতে পারে। নিচে

---

১. ইকোনমিক টাইমস, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

অবস্থানকালীন অবস্থায় জলের তলা থেকে শব্দ ওপরে ভেসে আসে না।

তবে জার্মান সাবমেরিন কোম্পানি বাড়তি যন্ত্রাংশগুলির জন্য ২ কোটি ৩০ লক্ষ জার্মান মার্ক (জার্মান মুদ্রা) বেশি চেয়েছিল, যেটি আবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আরো বেশি দামে তোলা হয়েছিল, ৬ কোটি মার্ক। পরে ১৯৮৫ সালে সাবমেরিনের যন্ত্রাংশ কেনার জন্য নতুন করে কথাবার্তা চলার সময়ে ছ' কোটিকে বারো কোটি মার্কে তোলা হয় ব'লে শোনা যায়।

এইভাবে দাম যখন ক্রমশঃই বাড়ানো হতে থাকে তখন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় যে চারটির বদলে তিনটি সাবমেরিন পূর্ণ কার্যক্ষম অবস্থায় কেনা হবে। দুটি সাবমেরিন জার্মানি থেকে তৈরী হ'য়ে আসবে—একটি বোম্বাইয়ের ডকে নির্মিত হবে আর চতুর্থটির ক্ষেত্রে আস্ত জাহাজ না কিনে তাদের যন্ত্রাংশগুলি নেওয়া হবে ভবিষ্যতে অন্য সাবমেরিনগুলি মেরামতির প্রয়োজনে।

১৯৮৬ সালের অক্টোবরে প্রথম ডুবোজাহাজটি গ্রহণ করার পর এই জাহাজের কার্যকরী পরীক্ষার ফলটি আশানুরূপ হ'ল না। টর্পেডো বিস্ফোরণে মারাত্মক ত্রুটির সন্ধান পাওয়া গেল।

জানা গেছে এই টর্পেডো কেনায় এক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞের মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় জানা গেছে টর্পেডোর মডেলটি পুরনো কালের—এর চেয়ে উন্নত ধরনের মডেল তৈরী হয়ে গেছে। ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই সাবমেরিন আর পুরনো মডেলের টর্পেডো ব্যবহার ক'রে আর্জেন্টিনীয়রা নৌযুদ্ধে পরাস্ত হয়। শুধু ত্রুটিযুক্ত টর্পেডো নয়—জার্মান সাবমেরিনের আওয়াজ জলের নিচে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়।

অন্য বিপজ্জনক খবরও রয়েছে। যে সাবমেরিন জার্মানির কোম্পানি ভারতকে দিয়েছে তার নক্সাটি ওই কোম্পানি দক্ষিণ আফ্রিকাকেও বেচেছে। মারণাস্ত্র ব্যবসায়ে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক নজীর। পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্ট এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

জার্মান সাবমেরিন কেনাবেচায় ভারতীয় দালাল থাকার সংবাদ বন থেকে টেলেক্স বার্তা পাঠাবার আগেই প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে ইরাণকে জার্মান সাবমেরিন বেচার জন্য চেষ্টা হয়। এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানির যে এজেন্ট ইরাণের শাহের সঙ্গে কথাবার্তা চালান, তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় ও ভারতীয় পরিবারভুক্ত, কিন্তু পরে অনাবাসী ভারতীয় হিসাবে বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুজা পরিবারের মানুষ। এই পরিবার ভারতের বাইরে বিভিন্ন মারণাস্ত্র ও সামরিক পণ্য নির্মাতা সংস্থার 'কমিশন এজেন্ট' বা দালাল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পরিবারের দুই ভাই ব্যবসার অংশীদার, শ্রীচাঁদ হিন্দুজা ও অশোক হিন্দুজা।

*   *   *

ইরাণের সঙ্গে চুক্তির শুরুতে একটি সাবমেরিনের দাম ৭ কোটি ডলার ধরা হয়েছিল, সেটি অবশ্য আজ থেকে ছয় বছর আগে ১৯৮২ সালে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যখন দামের চূড়ান্ত কথাবার্তা হয় ১৯৮৬ সালে, এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানি একটি সাবমেরিনের জন্য ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার বাড়তি চেয়ে বসে। অর্থাৎ দাম বাড়িয়ে প্রতি সাবমেরিনের দর বলা হল ১০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। ইরাণের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। ইরাণের শাহের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে কিন্তু তার কয়েক বছর বাদেই ভারতে এক নবীন রাজনৈতিক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দুজা পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটলো রাজধানী দিল্লীতেই।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীর কথা জানা যায়। রামচন্দ্র দত্তাত্রেয় শাঠে ছিলেন ইরাণে ভারতের রাষ্ট্রদূত ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত। শ্রীশাঠেকে পশ্চিম জার্মানীতে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করা হলো ১৯৮২ সালে। ১৯৮৪ পর্যন্ত তিনি রাজধানী বন শহরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ছিলেন। তার পরেই শ্রীশাঠেকে বিদেশ সচিবরূপে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনা হয়। এই শাঠে নামে মাননীয় ভদ্রলোক ভারত সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর হিন্দুজা ফাউন্ডেশনের বোম্বাই

অফিসের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। গত বছর অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে তিনি হঠাৎ ওই পদ থেকে অবসর নিলেন। স্মরণীয়, ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির রাজধানী বন শহর থেকে টেলেক্স বার্তা আসে দিল্লীতে উৎকোচ দেওয়ার সংবাদ নিয়ে। এগারোই মার্চ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তদন্তের নির্দেশ দেন। ৩১ মার্চ কর্ম নিয়োগের সময় শেষ হবার আগেই শ্রীশাঠে হিন্দুজা ফাউন্ডেশন থেকে স্বেচ্ছা-বিদায় নিলেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ সিং জানিয়েছিলেন ভারত জার্মান সাবমেরিন কিনবে না।[২] কিন্তু ইংরেজি সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকায় এক সংবাদে জানানো হয়েছে ভারত সরকারের সঙ্গে জার্মান কোম্পানির কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায় নি—তখনো চলছে। এই সংবাদ সাপ্তাহিক সাময়িকী বন শহরে এইচ ডি ডব্লিউ-র দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে ব'লে দাবি করেছে। সম্ভবত অরুণ সিং আরেকটি ধাক্কা খেলেন।

শেষ পর্যন্ত দর কষাকষি করে আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরের হিসাবে ৪৩০ কোটি টাকার সাবমেরিন ৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় ১৯৮৭ সালের গোড়ায়। এটি এখন ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, ভারতের টাকার তুলনায় জার্মান মুদ্রা মার্ক-এর দামটি বেড়ে যাওয়ার দরুণ।

এখন প্রশ্ন আমরা কোথায় চলেছি? সাবমেরিনের ক্ষেত্রে দালালি দেওয়া হয়েছে ব'লে শ্রীসিং-এর পরবর্তী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ রাজ্যসভায় প্রায় স্বীকার করেই নিয়েছেন ব'লেই শোনা গেছে।[৩] এপ্রিল মাসে প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীসিং। তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন ৯ এপ্রিল। কিন্তু জুন মাসের ২৭ তারিখে জার্মানিতে এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানির অফিসে তদন্তের খবর পাঠানো হল। স্বভাবতই প্রশ্ন, সরকারের পক্ষ থেকে এমন জরুরী ব্যাপারে এই গাফিলতি কেন?

২. সানডে, ৩-৯ মে ১৯৮৭।

৩. দ্য স্টেটসম্যান, ২৯ আগস্ট ১৯৮৭।

সরকার তাঁদের কাজের ধারা থেকেই সাধারণের সন্দেহ ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলেছে। গত বছরের আগষ্ট মাসে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, অরুণ নেহরু, রামধন, আরিফ মহম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিয়ে সাবমেরিন চুক্তির তদন্ত-ব্যাপারটি যাতে চাপা না পড়ে তার জন্য জোর তাগাদা দিয়েছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট আস্থা সহকারে বলেছিলেন সাবমেরিন কেনাবেচায় কোনো ভারতীয় দালালের অস্তিত্ব হয়তো নেই কিন্তু অনাবাসী ভারতীয় দালাল-গোষ্ঠী রয়েছে বলেই তাঁরা মনে করেন। বিগত ৩রা আগষ্ট (১৯৮৭) লোকসভায় তাঁরা জানিয়েছিলেন কোম্পানির বিবৃতি থেকে জানা যায় কোনো ভারতীয় দালাল নিয়োগ করা হয়নি। ওই বিবৃতিতে এটি পরিস্কার হয় না যে, অভারতীয় বা অনাবাসী ভারতীয় নিয়োগ করা হয়নি।

তবে সংবাদপত্রে এই খবরটিও প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সম্ভাব্য দালালের নামটি জানার পরেই তদন্তের সিদ্ধান্তে আসেন।[৪] এই তথ্য বিশ্বনাথ প্রতাপ এক চিঠিতে ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

ওই চিঠিতে বিশ্বনাথ প্রতাপ বলেছেন, সংশিলষ্ট ফাইলে তিনি ওই ব্যক্তিদের নাম স্পষ্টভাবে লিখে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পাঠিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের আদেশটিও জানিয়ে দেন। তাঁর মতে ওই দালালগোষ্ঠী অনাবাসী ভারতীয় এবং বিদেশে রেজিস্ট্রিকৃত।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিঠিতে বিশ্বনাথ প্রতাপ উল্লেখ করেছেন, কোনো ভারতীয়কে দালালি বাবদ টাকা দেওয়া হয়নি একথা বলা কায়দা করে আসল সত্যটুকু এড়িয়ে যাওয়া। বিশ্বনাথ প্রতাপ আরো জানিয়েছেন, 'সাবমেরিন চুক্তি নিয়ে তদন্তের ব্যাপার যেভাবে চেপে যাওয়া হচ্ছে তাতে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' তাঁর মতে, 'সরকারের মনোভাব থেকে প্রমাণ হয় এক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ থাকায় উচ্চ মহলের লোকেরা কিছু লুকোতে চাইছেন যেমন

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ আগষ্ট ১৯৮৭।

কায়েমী স্বার্থ রয়েছে বোফর্সের ব্যাপার নিয়ে এবং অমিতাভ বচ্চনের সুইস ব্যাঙ্কের অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে।'[৫]

বিশ্বনাথ প্রতাপ আরো জানিয়েছেন, জার্মানি থেকে টেলেক্স বার্তা একই সময়ে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও পায়। কিন্তু ওই দপ্তর থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ওই টেলেক্সে রাষ্ট্রদূত দালালদের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেছিলেন।

বিশ্বনাথ প্রতাপ তাঁর চিঠির কোনো উত্তর পাননি। বোফর্সের মতন এই কোম্পানীও স্বদেশে অভিযুক্ত হয়েছে—ভারতে প্রেরিত সাবমেরিনের মডেলের নক্সা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিক্রি করার অভিযোগে। পঞ্চাশ হাজার মার্ক জরিমানাও দিয়েছে।

ভারত সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক বলে অনেকে মনে করেন। বিশ্বনাথ প্রতাপের চিঠির মূল সুর থেকে সেটাই মনে আসে। তবে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে দ্বিধা কিন্তু থেকেই যায় যে, সরকার কাকে আড়াল করতে চাইছেন? দালাল সংস্থাকে না এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানিকে? নাকি উভয়কেই?

জানার কথা হ'ল, এইচ ডি ডব্লিউ কোম্পানির মোট মূলধনে পশ্চিম জার্মানীর সরকারের ৭৫ শতাংশ বিনিয়োগ রয়েছে এমন একটি আধা সরকারি সংস্থা বাজারের নিয়ম মাফিক সূত্র মেনেই দালাল নিয়োগ ক'রে থাকে কিন্তু দেশের আইন ভেঙে তথ্য পাচার করতে পারে না—যা ওই কোম্পানি করেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাবমেরিনের নক্সা বিক্রি করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—তা সত্ত্বেও দেশের আইন ভঙ্গ করেই কোম্পানির কর্তা-ব্যক্তিরা বে-আইনি পথে যেতে দ্বিধা করে নি বোফর্স কোম্পানির মতোই। ভারতের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারটিতে দালাল গোষ্ঠী হিসেবে অনাবাসী ভারতীয় সংস্থা হিন্দুজা গোষ্ঠীর গ্লোব টেক করপোরেশনের নামটি শোনা যাচ্ছে।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের কেনাবেচায় কোনো দালাল থাকবে না এমন একটি শর্তের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঘটনায় ভারত সরকারের অপদস্থ হওয়ার পরিস্থিতি বিস্ময়ের সঙ্গে রহস্যের উদ্রেক করে বৈকি !

ভারতে সামরিক ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা

তৃতীয় বিশ্বে যুদ্ধাস্ত্র আমদানির ব্যাপারে ভারতের স্থান ছিল চতুর্থ। এটি চার বছর আগের ঘটনা। তৃতীয় বিশ্বের সাড়ে ছয় শতাংশ যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করতো ভারত।[১] এখন পরিমাণটি দু'গুণের ওপর উঠে গেছে বারো দশমিক আট শতাংশ। নিচের সারণীতে ১৯৮৬ সালে তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের যুদ্ধাস্ত্র আমদানির তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সারণী ঃ ১[২]

দেশ	আমদানিকৃত যুদ্ধাস্ত্রের মূল্য (মিলিয়ন ডলার হিসাবে)	শতকরা হিসাবে
সৌদি আরব	৩১৯২	২২.৮
ভারত	১৮৪৯	১২.৮
ইজিপ্ট	১৪৬৪	১০.২
ইরাক	১৩৩৪	৯.৩
দক্ষিণ কোরিয়া	১২৩৩	৮.৬
চীন	৭৭৫	৫.৪
ইরাণ	৭০০	৪.৯
আলজিরিয়া	৫৫২	৩.৮
ইন্দোনেশিয়া	৪৭৪	৩.৩
তাইওয়ান	৩৩০	২.৩

তালিকা থেকে জানা যাচ্ছে ভারত চীন দেশের থেকেও দ্বিগুণের বেশি যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করেছে। এশিয়ায় এখন যুদ্ধরত দেশ

১. SIPRI Year Book 1983 পৃ. ২৭০

২. উৎস ঃ Strategic Analysis, September 1987

ইরাক ও ইরাণ। ১৯৮২ সালের তথ্যে[৩] ভারত ঐ দুই যুদ্ধরত দেশের থেকেও বেশি পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আমদানি করেছে। ১৯৮২ সালে ইরাক ছিল ষষ্ঠ স্থানে, ইরাণ নবম স্থানে। চার বছর বাদে যুদ্ধরত দেশ দুটি অস্ত্র কেনার পরিমাণ ভারতের তুলনায় বাড়ায় নি—অথচ ভারতে এখন কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতি নেই। তবু ১৯৮২ সালে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার অস্ত্র আমদানি ১৯৮৬ সালে ২৫০০ কোটি টাকায় পেঁাছে যায়।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতের বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে খরচ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা, ১৯৮৭ সালে ১২,৫১২ কোটি টাকা। বেড়েছে ৭৪ গুণের বেশি ৩৭ টি বছরে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় কিন্তু বেড়েছে ২৭ গুণ। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৯৫২৩ কোটি টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালে ২,৬১,৪৬০ কোটি টাকা। দেশের জাতীয় আয় যে হারে বাড়ছে প্রায় তার তিন গুণ বেশি হারে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়টি বেড়েছে। প্রতি বছর জাতীয় আয় বেড়েছে প্রায় দশ শতাংশ হারে কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে খরচের বৃদ্ধি প্রায় বারো শতাংশ হারে। এখন জাতীয় আয়ের চার শতাংশ খরচ হয় প্রতিরক্ষা খাতে। ১৯৫০-৫১ সালে দু শতাংশের নিচে ছিল।

অর্থনৈতিক প্রগতি থেকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি বাস্তব বিচারে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রতিরক্ষায় বৃদ্ধির হার এমন না হলেও চলে বিশেষ করে যখন যুদ্ধজনিত জরুরী পরিস্থিতি নেই—অথচ দেশের সার্বিক উন্নয়ন খাতে অর্থের অভাবে যেমন বাজেটে ঘাটতি বৃদ্ধি করতে হচ্ছে এবং বিদেশী দেনা বৃদ্ধিও অপ্রতিহত, সেই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা খাতে বর্তমানের বিশাল ব্যয় কতখানি প্রাসঙ্গিক সে-প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের দুটি প্রধান দিক রয়েছে—সেনাবাহিনী বহন করার খরচ আর যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম কেনার

৩. SIPRI Year Book, 1983, পৃ. ২৭০

খরচ। ভারতের 'প্রতিরক্ষার' সাজসরঞ্জাম কেনার প্রায় ৯০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ১৯৭৫ সালের আগে বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র কেনার ব্যয় প্রতিরক্ষার মোট খরচের তুলনায় খুব বেশী ছিল না—মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সাত থেকে আট শতাংশ। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রযুক্ত জরুরী অবস্থার সময়ে বিদেশ থেকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনার ব্যয় আকস্মিক-ভাবেই বেড়ে যায়।

১৯৭৪ ও '৭৫ সালে যে ব্যয় ছিল ১৯০ কোটি ও ১৭০ কোটি টাকার মতো, ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯০ কোটি ও ৭২৫ কোটি টাকার মতো। ভারতে জরুরী অবস্থার ঐ দুবছরে প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম কেনার খরচ যা মূলতঃ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় তা আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল। ১৯৭৬ সালের মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ২১ শতাংশ হয়ে গেল যুদ্ধের সরঞ্জাম আমদানির খরচ। ১৯৭৭ সালে তা বাড়লো ৩০ শতাংশে। এর পরেই লক্ষ্য করার মতো ঘটনা ঘটলো জনতা সরকারের আমলে। ঐ সময়ে দু'বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয় কমিয়ে দেওয়া হয় লক্ষণীয় ভাবে। যদিও প্রতিরক্ষার জন্য মোট খরচ তিনশো থেকে চারশো কোটি টাকা পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হয়েছিল দুবছর।

জরুরী অবস্থার শেষের বছরটিতে বর্ধিত আমদানির পরিমাণটি ছিল ৭২৫ কোটি টাকা। জনতা আমলে ১৯৭৮ সালে তা কমিয়ে দেওয়া হল ২৯০ কোটি টাকায়—পরবর্তী বছর ৪৯০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষার মোট ব্যয়ের তুলনায় যা ছিল ১১ ও ১৫ শতাংশ। কিন্তু জরুরী অবস্থায় ঐ খরচ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ত্রিশ শতাংশে তুলে আনা হয়েছিল, জনতা সরকার তা কমিয়ে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য, ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় যেমন বেড়ে যায় তেমনি বিদেশ থেকে যুদ্ধাস্ত্র আমদানির খরচও বেড়ে যায়। জনতা আমলের শেষ

বছরটিতে (১৯৭৯) প্রতিরক্ষা খাতে মোট যা ব্যয় হয়েছিল পরের বছর পাঁচশো কোটি বাড়ানো হল। সেই সঙ্গে বাড়ানো হল সামরিক সাজসরঞ্জাম আমদানির ব্যয়—৪৯০ কোটি টাকা থেকে ৮২৫ কোটি টাকা—প্রায় দ্বিগুণ, এবং এই ব্যয় মোট প্রতিরক্ষা খরচের ২৩ শতাংশ।

এর পরের বছর থেকেই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। যেমন ১৯৮০ সালের বৃদ্ধির পরিমাণ পাঁচশো কোটি টাকা। ১৯৮১-তে ছশো কোটি টাকা। ১৯৮২-তে সাতশো কোটি টাকা। ১৯৮৩-তে আটশো কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। মূল কারণ হলো, বাজেট বৃদ্ধির বেশিটাই বিদেশ থেকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম আমদানি খাতে ব্যয় হয়েছে।

১৯৮১ সালে হাজার কোটি টাকার মতো যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে পনেরো শত কোটি টাকা। এই দু'টি আমদানি ব্যয় পর্যায়ক্রমে ঐ দু'বছরের মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ২৪ ও ২৮ শতাংশ। ১৯৮০ সালে দিল্লীতে ক্ষমতায় আসীন হয়ে শ্রীমতী গান্ধী ফিরিয়ে আনেন জরুরী অবস্থার সময়কালীন পরিস্থিতি—অন্তত বিদেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা কাটার ব্যাপারে। মোট সামরিক ব্যয়ের ২৫ শতাংশ ছাপিয়ে যায় সামরিক সাজসরঞ্জাম কেনায়।

১৯৮৬ সালের আনুমানিক হিসেব থেকে জানা যায় বিদেশ থেকে সামরিক পণ্য কেনার দরুণ ২৫ শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে—যে খরচটি কয়েক বছর আগে ১৯৮২ সালের দ্বিগুণ।

এই সব হিসেবের অংক জুড়ে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়কালে বিদেশ থেকে ভারতের যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির সম্ভাবিত মোট ব্যয়ের অংক তেরো হাজার কোটি টাকার মতো। সম্ভাবিত ব্যয় বলা হচ্ছে এই কারণে যে যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির নিখুঁত হিসাবটি অত্যন্ত গোপনীয় বলে সরকারি তরফ থেকে তা প্রকাশ করা হয় না।

ব্যাপারটি এমনতরো গোপনীয় যে ভারতে সামরিক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিও তা জানতে পারবেন না। কিন্তু তাঁরই আদেশ বলে নিযুক্ত প্রতিরক্ষা সচিব বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তা জানতে পারেন। তবু এমন একটি অদ্ভুত ব্যবস্থায় কোনো কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই একেবারে গোপন থাকতে পারে না।

বিদেশ থেকে এই সব সাজসরঞ্জাম আমদানির সংবাদ শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে যায়। কারণ, দালাল বা মধ্যস্থ সংস্থা মারফৎ যুদ্ধের সরঞ্জাম আমদানি করতে হয়। ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিদেশী কোম্পানির ভারতীয় দালাল নিয়োগ বন্ধ থাকে না। ধনতান্ত্রিক জগতে ব্যবসার এটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এজেন্ট বা মধ্যস্থ সংস্থার মারফৎ যুদ্ধাস্ত্র আমদানি রপ্তানির কাজ চলে। এজেন্টের কাজ কর্মের ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া হয়। বলা হয় কখনো, পরামর্শদানকারী সংস্থা (কনসালট্যান্ট), প্রতিনিধি বা বাজার সহায়ক সংস্থা—প্রাপ্য কমিশনের ব্যাখ্যাও নানাভাবে দেওয়া হয়। সবটাই প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বা অস্ত্র কেনার ব্যয় থেকেই আসে। প্রতিরক্ষা খাতের বড়ো রকমের ব্যয় এই কমিশন বাবদ চলে যায়। ভারতের বোফর্স কামান আর জার্মান সাবমেরিন কেনার ব্যাপারে যা প্রকাশিত হয়েছে।

একাধিক অস্ত্র দালাল মারফৎ যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি সংকলিত করে ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আমদানির পরিসংখ্যান বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সংকলিত পরিসংখ্যান সারণীবদ্ধ তালিকায় পরপৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হল। এই তালিকাবদ্ধ পরিসংখ্যানের তথ্য অনুসারেই বিদেশ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে।

সারণী : ২

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় ও বিদেশ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির ব্যয় : (কোটি টাকায়)

বৎসর	মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়	যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানি	প্রতিরক্ষা ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে আমদানি
১৯৭৫	২২৫১	১৭০	৭৫
১৯৭৬	২৩৪৭	৪৯০	২১
১৯৭৭	২৩৮৬	৭২৫	৩০
১৯৭৮	২৬১৪	২৯০	১১
১৯৭৯	৩০৯৪	৪৯০	১৫
১৯৮০	৩৫৪০	৮২৫	২৩
১৯৮১	৪১৬৭	১০০০	২৪
১৯৮২	৪৮৮২	১৫০০	২৮
১৯৮৩	৫৬৬৭	১৬০০	২৮
১৯৮৪	৬৩৯৯	১৮০০	২৮
১৯৮৫	৭৮৮৬	২০০০	২৬
১৯৮৬	৮২০০	২৫০০	৩০
১৯৭৫-৬	৮৫৩৪৩৩	১৩২০০	২৫

ভারতীয় সামরিক বিভাগের উন্নয়ন কাজের শুরু বলা চলে ১৯৬২ থেকে। ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রের বাজেটে সামরিক খাতে ব্যয় আগের বছর থেকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হলো। নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ লক্ষ্য পড়ে। বিদেশ থেকে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক সাজ সরঞ্জাম আমদানি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তৎপরতা পঞ্চাশের দশকে ছিল না।

তবে, ১৯৬২ সালের পরেও বেশ কিছু বছর প্রতিরক্ষা খাতের

বিভিন্ন ব্যয়, বিশেষ করে বিদেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের একটি স্থিতিশীল নীতি মেনে চলা হচ্ছিল। কিন্তু আমদানি সংক্রান্ত বিষয়টি জরুরী অবস্থার সময়কাল থেকে আকস্মিকভাবে বদলে দেওয়া হয়। যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি আরো বাড়িয়ে দেওয়া হল। কংগ্রেস দলের রাজত্ব-কালীন সময়কালের এই স্তরটি লক্ষণীয় বিশেষ করে। কারণ, এই সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রভাব অতি দ্রুত অপসৃত হতে থাকে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিম য়ুরোপীয় যুদ্ধাস্ত্রের বাজার আধুনিক অর্থে সাবালক হয়ে ওঠে। অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হতে থাকে। এই সত্তর দশকেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট গভীরতর হয়ে ওঠে। এই সংকট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার একমাত্র রাস্তা হল সামরিক অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করা। অস্ত্রের বাজারে নেমে পড়া।

বিশ্বের যুদ্ধাস্ত্রের বাজার, বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩৭ শতাংশ ভাগ এখনো মার্কিন দখলে এবং আরো বাইশ শতাংশ মার্কিন নীতির অনুগামী ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী ও সুইডেনের দখলে—মোট ৫৯ শতাংশ[৪] সামরিক সরঞ্জামের রপ্তানীর নায়ক হল ধনতান্ত্রিক বিশ্বের মাতব্বর দেশগুলি। ষাটের দশক থেকেই মার্কিন অর্থনীতি সামরিক আর্থব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়। একমাত্র কারণ হল, প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সংকট। জানা গেছে, মার্কিন আর্থ-ব্যবস্থায় প্রতি পাঁচজনের একজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন বা বিক্রির কাজে নিযুক্ত। মার্কিন অর্থনীতির সংকট-মুক্তির এই রাস্তা অতি স্বাভাবিকভাবেই য়ুরোপীয় ধনতন্ত্রকে আকৃষ্ট করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, সুইডেন বিশ্ব-সামরিক অর্থনীতি ও অস্ত্র বাজার সম্পর্কে সচেতন হয়ে

৪. SIPRI Year Book 1983, পৃ. ২৬৯।

ওঠে। পারিপার্শ্বিক বিশ্বের ঘটনাবলীও য়ুরোপীয় ধনতন্ত্রের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

বিশেষ করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, পেট্রোলিয়ম উৎপাদক মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি স্বদেশের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সজাগ হতে শুরু করে। আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম কেনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখনই নব জাগ্রত বিশাল এই বাজারের দখল পেতে ধনতান্ত্রিক য়ুরোপীয় শক্তিগুলি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এই প্রতিযোগিতা চালাবার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে অস্ত্র বাজারের কমিশন এজেন্টরা।

অস্ত্র নির্মাতার কাছ থেকে কমিশন বা দালালি পেয়ে থাকে এই সব সংস্থা। এরাই ছড়িয়ে দেয় ঘুষের সম্ভার ক্রেতার পকেটে। ঘুষের টাকা জোগায় অবশ্যই অস্ত্র নির্মাতা সংস্থা—ঐ টাকাটাই তুলে নেওয়া হয় অস্ত্রের দাম মারফৎ ক্রেতা দেশের ভাঁড়ার থেকে। মূল দামের সঙ্গে ঘুষের টাকা, দালালির টাকা যুক্ত হয়ে অস্ত্রের বাজারগত দামটি ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাজারে প্রতিযোগিতা যত বাড়ে, ঘুষ বা 'কিকব্যাক' নামক গোপন সম্পদের পরিমাণও বাড়াতে হয় সেই পরিমাণে। প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাকে হঠাবার মোক্ষম অস্ত্র এই ঘুষ যা ক্রেতা দেশের উচ্চ-পদস্থ সামরিক অফিসার বা রাজনৈতিক প্রশাসনিক পদাধি-কারীকেও দেওয়া হয়ে থাকে।

অস্ত্রবাজার থেকে বিশাল পরিমাণে ঘুষ নেবার গোপন সংবাদ প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় নেদারল্যান্ডের সিংহাসনারূঢ় মহামান্য রানীর স্বামী প্রিন্স বার্নহার্ড ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী তানাকা অত্যন্ত দুর্নাম নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপদ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এটি সম্প্রতিকালের ইতিহাসের অংশ।

সম্প্রতি আবার বিশ্বের অস্ত্রবাজার সংকুচিত। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। আন্তর্জাতিক দেনার ফাঁদে পড়ে ক্রমাগত বাজেট ঘাটতি ও বাণিজ্য ঘাটতির চাপে বিব্রত এই

দেশগুলি মোট সামরিক বাজেট কমিয়ে দিতে না পারলেও যুদ্ধাস্ত্র কেনা কমিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অস্ত্রবাজারের রমরমা কিঞ্চিৎ কমেছে। অস্ত্র নির্মাতা প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সংকটে বাজার সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে যুদ্ধাস্ত্র কেনাবেচায় এখন ঘুষের রমরমা ক্রমবর্ধমান।

বোফর্স কোম্পানীর কামান বা জার্মান ডুবোজাহাজ কেনা-কাটার ব্যাপারে যে কেলেংকারী ও কেচ্ছাকাহিনী সারা বিশ্বময় রটে চলেছে তাও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল না। জার্মান ডুবোজাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সুইডেনের কোকুমস ডুবোজাহাজ কেনার প্রসঙ্গটিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার্য ছিল।

বোফর্স এফ-এইচ-৭৭ বি কামানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আরো তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দূরপাল্লার কামান নির্মাতা দেশ দিল্লীতে হাজির হয়েছিল। ব্রিটিশ-জার্মান-ইটালি এই তিন দেশের সহযোগিতায় নির্মিত কামান এফ-এইচ-৭০, অস্ট্রিয়ার জি-এইচ-এন-৪৫ এবং ফরাসী গিয়াট-১৫৫-টি-আর। এসব ১৯৮১ সালের ঘটনা। ১৯৮৬ সালের মার্চে আর সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাদ দিয়ে বোফর্সের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়। বোফর্সের সঙ্গে কমিশন এজেন্ট হিসাবে ভারতীয় ব্যবসায়ী উইন চাড্ডা ও তাঁর এ্যানাট্রনিক জেনেরাল করপোরেশন নামের সংস্থাটি জড়িত বলে সংবাদ প্রচারিত। জার্মান ডুবোজাহাজের সঙ্গে কমিশন এজেন্ট হিসাবে অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী হিন্দুজা গোষ্ঠী জড়িত।

বোফর্স এ বি কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হল ১৭০০ কোটি টাকার। কামানের দাম ১৪২৭ কোটি টাকা, বাকীটা গোলাগুলি ও আনুষঙ্গিক রসদের দাম—যেগুলি আসবে অন্য সব বিদেশী সংস্থা থেকে। পশ্চিম জার্মানীয় ডুবোজাহাজ কেনার চুক্তিটি ৪৩০ কোটি টাকার। এই দুটি বিশাল অঙ্কের খরিদ ব্যাপারে দামের তিন শতাংশ কমিশন ও চার শতাংশ ঘুষ ছড়ানো হয়েছে বলে সংবাদে প্রচারিত। সম্প্রতি আবার বোফর্সের কর্তারা এদেশে এসে জানিয়েছেন বাইরের কয়েকটি সংস্থাকে বোফর্স কোম্পানী

যা দিয়েছে তা মোট মূল্যের সাত শতাংশ নয়, বারো শতাংশ—এই পরিমাণ টাকা ছড়ানোকে বোফর্স কর্তৃপক্ষ কমিশন বা ঘুষ বলে অভিহিত করছেন না কিন্তু কামান বিক্রির স্বার্থে বাইরের সংস্থা বা ব্যক্তিকে যাই দেওয়া হোক না কেন এই টাকাটি কামান বিক্রির টাকা থেকেই দেওয়া হয়েছে—দিতে হয়েছে ভারতকে। আরো কি, এই দুটি সামরিক সরঞ্জামের ঘোষিত সক্রিয়তা সম্পর্কেও এখন যথেষ্ট সন্দেহ উত্থাপিত হয়েছে। সরঞ্জামগুলি উচচমানের নয় বলে সংশিলষ্ট মহল থেকে অভিযোগের সংবাদ এসেছে।

উঁচু মাপে ঘুষ এবং কমিশনের চাপ নিম্নমানের সরঞ্জাম সরবরাহে দায়ী হয়—এমন ঘটনা বিরল নয়। ভারতের সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটার ইতিহাসে অবনত মানের সরঞ্জাম বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রয় করা হয়েছে এমন সংবাদের অভাব নেই। সরকারি বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট থেকেও যৎকিঞ্চিৎ তথ্য জানা যায়।

ষোল হাজার কোটি টাকায় জাগুয়ার বিমান কেনার বিষয়টি নিয়ে সামরিক বিভাগে অনেকদিন টালবাহনা চলে। ফরাসী যুদ্ধ-বিমান মিরেজ ছিল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। বিমান কেনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী যখন বিচার বিশেলষণ শেষ করে এনেছে সেই সময়ে মঞ্চে আবির্ভূত হন সঞ্জয় গান্ধী। এ-সব ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর কোনো সাংবিধানিক এক্তিয়ার ছিল না—না ছিল বিশেষজ্ঞতা কিংবা চূড়ান্ত রায় দেবার যোগ্যতা। ফরাসী মিরেজের প্রতি সামরিক বিশেষজ্ঞদের কৃপাদৃষ্টি থাকলেও শেষ পর্যন্ত জাগুয়ার কিনতে হয়।[৫]

প্রয়াত এয়ার মার্শাল প্রতাপলাল তাঁর আত্মকাহিনীর এক জায়গায় ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ব্যবহৃত অনেকগুলি নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণ না ঘটার কথা উল্লেখ করেছেন। বিস্ফোরকগুলি বিদেশী পণ্য।

ব্রিটেন থেকে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'হার্মিস' কেনার প্রসঙ্গটিও স্মর্তব্য। গত বছরে এই সমুদ্রযানের প্রাথমিক দাম উল্লেখ হয়েছিল ছ' কোটি পাউন্ড। কিন্তু এই বিশাল সামরিক সরঞ্জামের

৫. The Statesman, 15 June 1987.

বাড়তি যন্ত্রাংশ ও বিমানগুলি কেনাও চুক্তিতে রাখা হয়েছিল যার দামের উল্লেখ চুক্তিতে ছিল না বলেই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। বাড়তি উপকরণগুলির দাম কমপক্ষে তিনশো থেকে চারশো কোটি টাকা—সংবাদপত্রে এই তথ্য প্রকাশিত। সংবাদে আরো জানানো হয় যে ২৮ হাজার টনের এই জাহাজ যেটি ভারত কিনেছে পোর্টস-মাউথ বন্দরে তা বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেশ কিছুদিন পড়ে ছিল।[৫]

লোকসভার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি প্রায়শই সামরিক বিভাগের কেনাকাটার ব্যাপারে বেনিয়ম-অনিয়মের বেশ কিছু ঘটনার সমালোচনা প্রকাশ করেছে। অষ্টম লোক সভার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ১৯৮৫ সালে আগষ্ট মাসের ৪ তারিখে লোকসভায় যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে কোনো এক বিদেশী কোম্পানী থেকে ট্রেনার বিমান কেনার প্রসঙ্গ সূত্রে কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ট্রেনার বিমান কেনার আদেশ দেওয়ার পর ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে বিমানগুলির সরবরাহ পাওয়া যায়। অথচ পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মতে ভারতের হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স লিমিটেড নামের কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাটি এই বিমান নির্মাণের ভার নিতে পারতো। এমন কি বিমানগুলি সরবরাহ নেবার আগে তার অংশসমূহ পরীক্ষা করে দেখা এবং প্রয়োজনীয় মেরামতি বাবদ বিদেশী কোম্পানিকে তিন কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা বাড়তি দেওয়া হয়েছে—যে কাজটিও হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স করতে পারতো। বিমানগুলির দাম চোদ্দ কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি রায় দিয়েছে বিমানগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করার সিদ্ধান্ত বিবেচনাযোগ্য নয়।

সামরিক বিভাগের বিশেষ প্রবণতা রয়েছে বিদেশ থেকে সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারে—এই প্রসঙ্গে এমন সব সরবরাহকারী, কিংবা দালাল মারফৎ কেনাকাটি করা হয় যারা পাবলিক এ্যাকাউন্টস

৫. তদেব।

কমিটির মতে যথেষ্ট সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সংস্থা। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির অষ্টম লোকসভায় উপস্থাপিত ৫১তম রিপোর্টে (আগষ্ট, ১২, ১৯৮৬) এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কমিটির মতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এদের বেশ কিছু কাজকর্ম প্রত্যাশামত না হলেও ঘুরে ফিরে সামরিক বিভাগেই এরা ব্যবসা জমিয়ে বসেছে।

১৯৮৬ সালের ১৯ মার্চ পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি লোক-সভায় যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে দেখানো হয়েছে যে বিদেশ থেকে সওয়া চার কোটি টাকা দামের এমন ২৩টি সামরিক উপকরণ কেনা হয়েছে যেগুলি স্বদেশের সামরিক কারখানাগুলি থেকে অনায়াসে উৎপাদন করা যেতে পারতো। সামরিক কলকারখানার চালু উৎপাদন বন্ধ রেখে কার স্বার্থে বিদেশ থেকে দালাল মারফৎ উচ্চ দামে উপকরণ সংগ্রহ করা হয় পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি এই সঙ্গত প্রশ্নটি তুলেছেন।

আবার এমন সব উপকরণ কেনার অভিযোগ রয়েছে যেগুলি কখনোই কোনো কাজে লাগে না কিংবা কেনার পর বহু বছর ধরে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে অথচ কেনার সময় জরুরী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়—এই সব ক্রয় ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন পড়ে—এমন সমালোচনা প্রায়শ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যায়।[৬]

জার্মান ডুবোজাহাজ সম্পর্কে নানান কেচ্ছা কাহিনী শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই জার্মান সাবমেরিন ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এই সাবমেরিন থেকে উত্থিত শব্দজাল শত্রু-পক্ষকে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ফকল্যান্ডের যুদ্ধে এই সাবমেরিন পরিত্যক্ত হয়। ভারতে জনতা সরকারের আমলেও এই সাবমেরিন কেনার প্রসঙ্গ একবার ওঠে—কিন্তু নৌ-বিশেষজ্ঞেরা আপত্তি জানান। পরিবর্তে সুইডিস ডুবোজাহাজ 'কোকুমস' কেনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেষ

৬. কমার্স, জুলাই ২৫, ১৯৮৭।

পর্যন্ত, কেনার চুক্তি হয়নি—জনতা সরকারের পতন ঘটে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া তাদের নৌবহরের জন্য সুইডিশ ডুবোজাহাজই কিনেছে।[৭]

দিল্লীর মসনদে শ্রীমতী গান্ধীর পুনরাগমনের পর ১৯৮১ সালে ডুবোজাহাজ কেনার প্রসঙ্গটি ফিরে আসে। ঠিক এই প্রসঙ্গেই মঞ্চে সঞ্জয় গান্ধীরও পুনরাগমন ঘটে এবং শোনা যায় জনতা আমলে জার্মান ডুবোজাহাজের দামের তালিকায় যে অংকটি ছিল এবার সত্তর শতাংশ বাড়িয়ে তা উপস্থিত করা হয়।[৮]

বোফর্স কামানের গুণমান সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। এক হাজার চারশো সাতাশ কোটি টাকা এই কামানের দরুণ বোফর্স কোম্পানি পাবে। চার বছর ধরে কিস্তিতে দাম মেটানো চলবে—তার মানে চার বছর ধরে প্রতিদিন এক কোটি টাকা জুগিয়ে যেতে হবে সুইডিশ কোম্পানিকে।

জেনারেল বৈদ্য ফরাসী কামান কেনার পক্ষে ছিলেন, কারণ, ঐ কামানের ধাতু উপাদান বোফর্স কামানের থেকে বেশী টেঁকসই। তাছাড়া কেনার আগে পরীক্ষামূলক ট্রায়াল দেবার সময়ে এই কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা ঘোষিত দূরত্বে পেঁছায় নি—এমন সংবাদ রয়েছে। তাছাড়াও বোফর্স কামানের প্রযুক্তিগত কৌশল অধিকতর জটিল। ট্রায়াল দেবার সময়ে অপ্রত্যাশিত বাধার সৃষ্টি হলে তা সারাতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় বলে সংবাদপত্রে খবর বেরোয়।[৯] এছাড়াও অন্য বিপদ রয়েছে। বোফর্স কোম্পানি কামানের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করবে না—বিশেষ করে আসল জিনিসটি, দূর পাল্লার গোলা—সেটি পাওয়ার জন্য অন্যত্র যেতে হবে।

স্বভাবতই সেনাবাহিনী থেকে আপত্তি আসে। তাঁরা চান একই উৎস থেকে সব কিছু আসুক। কোনো একটি উপকরণের কার্যকারিতায় ঘাটতি থাকলে সেটি অন্যের ঘাড়ে চাপে না—

৭. দ্য স্টেটসম্যান, ১৫জুন, ১৯৮৭।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

যেমন কামানের গোলা নির্দিষ্ট দূরত্বে না পেঁছলে গোলা নির্মাণ-কারী বলতেই পারে—এটি মূল কামানের ঘাটতি, গোলার কার্য-কারীতায় ঘাটতি নয়—কামান নির্মাতা গোলা নির্মাণকারীর ওপরও দোষ চাপাতে পারে। বাজার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে বোফর্স কোম্পানী শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় যে দূরপাল্লার গোলা তারাই সংগ্রহ করে এনে দেবে! **এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কোন্ চাপে মেনে নিতে হয় তা রহস্যময়!**

এইভাবে কোটি কোটি টাকার অনর্থক ব্যয় প্রতিরক্ষা দপ্তরে চলেছে বলে অভিযোগ। এই ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে বিশাল ঘুষের অস্তিত্ব কোনো আনুমানিক তথ্য নয়। বিশ্ব অস্ত্রের বাজারে সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটার ব্যাপারে ঘুষের প্রবাহ আশির দশক থেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে। তার মূল কারণ হলো, এই দশকের শুরু থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমবর্ধিত অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে শ্লথগতি হয়ে পড়েছে। পড়তি বাজার উত্তপ্ত করে তোলায় ঘুষের সক্রিয়তা ধনতান্ত্রিক বাজারে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার। অর্থাভাবে ভারতের সপ্তম পরিকল্পনা যখন সংকটের আবর্তে, দেনার চাপে ভারত সরকারের বার্ষিক সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ব্যয় হল সরকারী দেনার সুদ সেইকালে ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশি অনুৎপাদক ব্যয় ঘটে চলেছে প্রতিরক্ষা খাতে। বর্তমান বছরে এই ব্যয় বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

'এ্যাডনান ক্যাশহোগ্‌গি' (Adnan Kashhoggi) নামের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অস্ত্র দালাল, যিনি বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র নির্মাতাদের কমিশন এজেন্ট বা দালাল হিসাবে পরিচিত তাঁর প্রদত্ত বিবৃতি থেকে জানা যায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে আট হাজার কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র সরঞ্জাম আমদানি করা হয়েছে ভারতে[১০]—যার মধ্যে বোফর্স কামান ও জার্মান ডুবোজাহাজও রয়েছে।

---

১০. ইন্ডিয়া টু-ডে ১৫ মে, ১৯৮৭।

বোফর্স কামান থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো ঘুষ ও দালালির খবর এবং জার্মান ডুবোজাহাজ থেকে ঐ একই খাতে ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় খুব আশ্চর্যজনক বা অকল্পনীয় ব্যাপার কিছু নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এসব চলেই থাকে। তবে ক্যাশহোগ্গি যে হিসেব দিয়েছেন, ভারতে আট হাজার কোটি টাকার মতো অস্ত্র আমদানি ঘটেছে গত তিন বছরে, তার মধ্যে ঘুষ ও দালালি বাবদ কত কোটি টাকা বেমক্কা ঢুকে গেছে আনুমানিক সে তথ্য তিনি দেন নি। তবে ঘুষ ও দালালি বিনা অস্ত্র বাজারে কেনাবেচা যে হয় না এটি তিনি নিশ্চিত করেই বলতে চেয়েছেন।

গত কয়েক বছরের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার কয়েকটি বিশাল মাপের হিসাব রয়েছে আমাদের হাতে যেগুলির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খরচের বাহুল্য লক্ষ্যণীয়।

বৃটেন থেকে বিমান বাহিনীর জন্য কেনা হয়েছে জাগুয়ার নামের সামরিক বিমান ৮৫টি, যাদের মোট মূল্য ২০০ কোটি ডলার।

বৃটেন থেকে কেনা হয়েছে চোদ্দটি ট্রেনার বিমান, দাম ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড।

ফ্রান্স থেকে আনানো হয়েছে ৪০টি মিরাজ বিমান, দাম ৩৩০ কোটি ডলার।

নৌবাহিনীর জন্য কেনা হয়েছে বৃটেন থেকে বিশাল বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ, হারমিস এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার। এই জাহাজটির দাম চুক্তির সময়ে ধরা হয়েছিল ১০৮ কোটি টাকা কিন্তু পরে দাম আরো ৩৬ কোটি টাকা বাড়তি দিতে হয়।

বৃটেন থেকে কেনা হয়েছে সি হ্যারিয়ার নামে সামুদ্রিক বিমান, সংখ্যায় ২১টি, মোট দাম ১০ কোটি ডলার।

বৃটেন থেকে আরো কেনা হয়েছে ২৯টি সামুদ্রিক হেলিকপ্টার যার দাম ৫০ কোটি ডলার।

পশ্চিমী জার্মানী থেকে ডুবোজাহাজ কেনা হয়েছে যার দাম ৪৮ কোটি ডলার।

স্থলবাহিনীর কাজে পশ্চিম জার্মানী থেকে এসেছে একশোটি আকাশপ্রহরী বিমান—ডোর্নিয়ার এয়ারক্রাফ্ট্, দাম ৫০ কোটি ডলার।

সুইডেন থেকে বোফর্স কামান, দাম ১৪২৭ কোটি টাকা।

বিদেশ থেকে আমদানি করা মাত্র ৯টি সামরিক সরঞ্জাম কেনার তথ্য পেশ করা হল, যাদের ভারতীয় টাকায় মোট মূল্য ১০ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা।[১১] এ ছাড়া আরো ছোটখাট আমদানি রয়েছে অগুন্তি। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪০ হাজার ৭৪১ কোটি টাকা। ঐ টাকার মধ্যে মাত্র ৯টি আমদানির ক্ষেত্রে খরচ হয়েছে ১০ হাজার ৫১৯ কোটি। এই আংশিক আমদানি ব্যয়টি মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ২৬ শতাংশ। বাকি আমদানিগুলি হিসেবের মধ্যে নিলে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ছাপিয়ে যায়।

দেখা গেছে প্রতিরক্ষা বিভাগে বিদেশ থেকে আমদানি করার বাহুল্যের বিরুদ্ধে এবং দালাল মারফৎ কেনাকাটা করার বিরুদ্ধে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি ক্রমাগত মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। সামরিক খাতে আমদানির সঙ্গে যে অনিয়ম বেনিয়মের অস্তিত্ব রয়ে গেছে সংবাদপত্রগুলির আগে লোকসভার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিগুলি সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে।

নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করা হয়, তার বিশেষ সব কারণ রয়েছে যা নিয়ে সংবাদপত্রে এখন খুবই হৈচৈ হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার মূল্যে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করার কারণেই ভারতের সামরিক বা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ঝোঁকটি বেড়েছে—যেটি এখন মূল বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ। বাজেটের অংশ হিসেবে এই বিশাল পরিমাণ সামরিক ব্যয় হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র দেশে

১১. দ্য উইক, ৩ মে, ১৯৮৭।

ঘটে চলেছে। বাজেটের ২৫ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব সামরিক খাতে ব্যয় করে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ-গুলি-সহ দশটি কি বারোটি দেশ। এখন উন্নয়নকামী ভারত এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এমন কি গত ক'বছরে দশ হাজার কোটি টাকার ওপর সামরিক সরঞ্জাম যে সব দেশের কাছ থেকে ভারত কিনেছে সেই বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও সুইডেনের সামরিক ব্যয় বাজেটের ২৫ শতাংশ নয়।

গত তিন বছর ফ্রান্সের সামরিক খাতে ব্যয় বাজেটের ৯ শতাংশের নিচে[১২], সুইডেনের আট শতাংশ[১৩], বৃটেনের সাত থেকে আট শতাংশ[১৪], পশ্চিম জার্মানীর এগারো শতাংশ[১৫]। এই-সব দেশ থেকে সামরিক পণ্য ক্রয়কারী ভারতের বাজেটে সামরিক ব্যয় এখন ত্রিশ শতাংশের কাছাকাছি। সামরিক পণ্য নির্মাতা দেশগুলি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করে বাজেটে সামরিক ব্যয় বাড়াতে সাহস পায় না কিন্তু রাজীব সরকার অকুতোভয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সামরিক খাতে মোট অর্থের পরিমাণটি ভারতের থেকে বেশি হতে পারে কিন্তু তা বাজেটের দশ থেকে পনেরো শতাংশের মধ্যেই থাকে। এই ভাবেই 'ব্যালান্সড' বাজেট তৈরী হয়—নচেৎ বাজেট ঘাটতি বেড়ে যায়। শান্তির সময়ে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়ে বাজেটের সমতা নষ্ট করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পক্ষে কাম্য নয় বলে স্বীকৃত। ভারতের বাজেটে বিপুল পরিমাণে ঘাটতি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে এবং বাজেটের সমতা রক্ষা করা ক্রমশঃই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—দিনের পর দিন বাজেট ঘাটতি বাড়ছে। ১৯৮৬ সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৮২৮৫ কোটি টাকা—কিন্তু বছরের গোড়ায় অনুমান করা হয়েছিল ঘাটতি হবে ৩৭০০ কোটি টাকা। সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ালে বাজেটে সমতা আনা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে সামরিক ব্যয় বাজেটের ত্রিশ শতাংশ এবং বাজেটে তাই বিপুল পরিমাণ ঘাটতির উদ্ভব।

১২, ১৩, ১৪, ১৫. The Europa Year Book Vol I+II 1987

ভারতের সামরিক খাতে ব্যয় কীভাবে বেড়েছে আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে। এই সঙ্গে জেনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক পণ্য আমদানির বাজারে ভারতের মোট পণ্য আমদানি বিশ্বের সমগ্র আমদানি বাণিজ্যের এক শতাংশ মাত্র। কিন্তু যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের যুদ্ধাস্ত্র আমদানির বাজারে ভারত তিন শতাংশ ভাগের অধিকারী।

১৯৮৬ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারত যে সব যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করেছে নিচে তার তালিকা-বদ্ধ সারণী রচিত হয়েছে—সামরিক পণ্য এবং সরবরাহকারী দেশ-সহ সামরিক উপকরণের মূল্য সারণীতে উল্লিখিত হয়েছে।

সারণী—৩[১৬]

সরবরাহকারী-দেশ	সামরিক পণ্য	সংখ্যা	মূল্য (মিলিয়ন ডলার)
১. অস্ট্রেলিয়া	মাজ্‌ল্‌ ভেলোসিটি ইন্ডিকেটর	জানা নাই	জানা নাই
২. ফ্রান্স	ডফিন হেলিকপ্টার	৬	১৪ ১৫
৩. ফ্রান্স	মিরেজ বিমান	৯	২১০ ০০
৪. সিঙ্গাপুর	প্রহরী স্থল যান	৬	১৩·৭৬
৫. রাশিয়া	মিগ বিমান	৪০	জানা নাই
৬. সুইডেন	বোফর্স কামান	৪০০	১২৫৩ ৭৩
৭. বৃটেন	সামুদ্রিক বিমান	৮	১৪২·৮৫
৮. ঐ	হেলিকপ্টার	৬	৩০·০০
৯. ঐ	হারমিস রণতরী	১	৮৪ ০০
১০. ঐ	এ্যাকচুয়েটর কম্পোনেন্ট	জানানাই	০ ৪৩
১১. ঐ	ট্যাঙ্ক সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ	১২০	৪ ২৮
১২. ঐ	দিক নির্ণয় যন্ত্র	জানানাই	৩৫·৭১
১৩. মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র	৪০৪ জেট ইঞ্জিন	১১	৬০·০০
		মোট	১৮৪৮.৯১

১৬. Strategic Analysis, September 1987.

উল্লিখিত ১৩টি উপকরণের মধ্যে ১১টির ক্ষেত্রে মোট দাম প্রায় ১৮৪৯ মিলিয়ন ডলার—ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা। অস্ট্রেলিয়া প্রদত্ত সামরিক উপকরণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মিগ বিমান—এই দুটির মূল্য যুক্ত হলে ১৯৮৬ সালে সামরিক পণ্য আমদানির মোট মূল্য ২৫০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। পরিমাণটি ১৯৮৬ সালের মোট প্রতিরক্ষা ব্যয় ৮২০০ কোটি টাকার ত্রিশ শতাংশ।

অহেতুক যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারে দেশজুড়ে প্রবল আপত্তির কথা শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ-নায়ার অভিযোগ তুলেছেন—১৯৮০ সাল, দিল্লীর মসনদে যে শ্রীমতী গান্ধীর পুনরাগমন সেই বছর থেকেই শাসক কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ভান্ডারে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছ থেকে রাজনৈতিক চাঁদা হিসেবে প্রাপ্যের পরিমাণ কমতে থাকে এবং কংগ্রেস দলও রাজনৈতিক চাঁদার জন্য পীড়াপীড়ি করা কমিয়ে দেয়। রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর চাঁদা চাওয়ার ব্যাপার বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে মান্যবর সাংবাদিক জানাচ্ছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিচালনায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সন্দেহ হচ্ছে এই অর্থ সংগৃহীত হতে চলেছে দেশের বাইরে থেকে।[১৭]

সেই কারণেই কি আন্তর্জাতিক অস্ত্র আমদানির বাজারে ভারতের ভাগ বেড়ে এখন তিন শতাংশ দাঁড়িয়েছে?

১৭. সানডে, ১০ মে, ১৯৮৭।

মারণাস্ত্র বাজারের দালাল

বিশ্ব মারণাস্ত্রের বাজারে এখন যথেষ্ট রমরমা চলছে। নতুন নতুন মারণাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ বাজারে আবির্ভূত হচ্ছে ঘন ঘন। আজকের অস্ত্র কালকেই পুরনো হয়ে যায়। একের পর এক ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী নতুন অস্ত্রের আবির্ভাবে মরণাস্ত্রের বাজার অন্য সব পণ্যের থেকে সবচেয়ে সজীব। সুতরাং বাজারে প্রতিযোগিতাও কম নয়। মৃত্যুর ফিরিওয়ালারা অস্ত্র বিক্রি বাড়াবার জন্য নানা ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় নেয়—এসব ফন্দি ফিকিরগুলি তথাকথিত সভ্যসমাজে স্বীকৃতি পেলেও গোপনে সারা হয়ে থাকে। এসব কাজে যথেষ্ট দালাল রাখার ব্যবস্থা হয়েছে—প্রকাশ্যে এবং গোপনে।

চীন-ভারত যুদ্ধের পর ভারত সরকার সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা বিভাগটিকে আধুনিক অস্ত্রে ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়ার সময় থেকেই বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক মধ্যস্থ সংস্থা বা দালাল গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে এদেশে। এরা যোগাযোগ রেখে চলে বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে যারা উন্নত ধরনের মারণাস্ত্রের কারবারী। ভারতের সামরিক বাজার এদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে অর্থাৎ ভারত সরকারের সামরিক পণ্যের চাহিদা এদের মারফৎ-ই পূরণ হয়ে থাকে।

জার্মানীর বন শহর থেকে যখন খবর এলো, ভারতের জার্মান সাবমেরিন কেনার ব্যাপারে দালালের যোগাযোগ রয়েছে, প্রচুর টাকা দালাল আত্মসাৎ করেছে—ভারত সরকার খবরটি সঙ্গে সঙ্গে সত্যি নয় বলে ঘোষণা করে। সরকার থেকে জানানো হয়, ১৯৮০ সাল থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগের যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে কোনো দালাল বা কমিশন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এদের বাদ দিয়েই কেনা-বেচা হয়। কিন্তু খবরটি জানার পরেই তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপারটি সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা নেন। এই ঘটনা দিল্লীর উচ্চতম মহলে যথেষ্ট ক্ষোভ আর ক্রোধের সঞ্চার করেছিল। এর পরবর্তী পর্যায় হলো মন্ত্রিসভা থেকে বিশ্বনাথ প্রতাপের পদত্যাগ।

এই সূত্রে অ্যাডনান ক্যাশহোগ্গির একটি মন্তব্য মনে রাখার মতো। বিশ্বের সবচেয়ে ধনবান মারণাস্ত্র দালালদের অন্যতম বলে তিনি পরিচিত। বিশ্বের অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে অস্ত্র কেনা-কাটার বিশ শতাংশ একা ক্যাশহোগ্গির দখলে। বোফর্স আর জার্মান সাবমেরিন সংক্রান্ত ঘটনার পর এই ব্যক্তি ভারতের একটি বিখ্যাত সংবাদ সাময়িকীর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলে-ছিলেন, **দালাল বাদ দিয়ে মারণাস্ত্র কেনাবেচা হয় না।**[১]

মারণাস্ত্র কেনাবেচায় সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করে ক্যাশহোগ্গি জানিয়েছিলেন, কোনো দেশের সরকার যখন স্বয়ং অস্ত্রকারবারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন ফালতু টাকার লেনদেন হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথাই ক্যাশহোগ্গি জানিয়েছিলেন।[২]

সি পি এন সিং ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী। ১০ই এপ্রিল ১৯৮৭, লোকসভায় বিতর্কে যোগ দিয়ে তিনিও বললেন, তাঁর জানা রয়েছে ১৯৮০ সাল থেকেই প্রতিরক্ষা বিভাগের কেনাকাটার ব্যাপারে বিদেশী কিংবা ভারতীয় দালালের অস্তিত্ব নেই। ব্যাপারটি তখন থেকেই বেআইনি কাজ বলে গণ্য হচ্ছে।

ঠিক এর পাঁচদিন বাদে মুখ খুললেন (১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৭) রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী অরুণ সিং। লোকসভায় তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ ক'রে বলেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ক্ষমতা অধিগ্রহণ ক'রে প্রতিরক্ষা বিভাগের কেনাবেচায় কোনো দালালের সাহায্য নেওয়া হবে না ব'লে যে সরকারী আদেশ রয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। রাজীবজী আরও ঘোষণা করেন যে, বিদেশী সরকার এবং সরবরাহ-কারীদের এই সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া দরকার।

---

১. ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ মে, ১৯৮৭।

২. তদেব।

খুবই কঠোরভাবে এই নীতিগত নির্দেশ মেনে প্রতিরক্ষা বিভাগ ভাল ফল পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

এই সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আবার শোনা যায়। ২০শে এপ্রিল (১৯৮৭) শ্রীগান্ধী রাজ্যসভায় বলেন, তাঁর সরকার প্রতিরক্ষার উপকরণ কেনার সময়ে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করে না। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কোনো দালাল থাকবে না, তা পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দেওয়া আছে।

তবে প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম কেনায় দালাল নেই, এমন সিদ্ধান্ত বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে কিছু কিছু চিঠিপত্র সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যায়। প্রকাশিত চিঠিগুলি প্রতিরক্ষার উপকরণ সরবরাহকারী নয়াদিল্লীর 'ইউরেকা সেলস করপোরেশন'-কে লেখা। এই প্রতিষ্ঠানটি বিদেশের বিভিন্ন মারণাস্ত্র সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিভাগ থেকে এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে। প্রত্যেকটি চিঠি ব্রিটেনের কোনো না কোনো যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে সরকারের ব্যবসা প্রসঙ্গে লিখিত।[৩]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই চিঠিগুলির নিদর্শন প্রমাণ দেয় যে প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে দালাল সংস্থা এখনো বিদায় নেয় নি। ১৯৮৬ সালেও এদের অস্তিত্ব ছিল। অথচ বলা হচ্ছে ১৯৮০ সাল থেকে এদের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগ নেই।

সুইডিশ রেডিও থেকে দাবি করা হয়েছে, ভারত সরকারের বক্তব্য সঠিক নয়, বোফর্স কামানের কেনাবেচায় দালালের অস্তিত্ব রয়েছে। এই সূত্রে শ্রীউইন চাড্ডার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রেডিও থেকে আরো জানানো হয়েছে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে শাসক কংগ্রেস দলের নেতারাও উৎকোচ প্রাপকদের দলে রয়েছেন।

---

৩. ক. Letter No. AIR. HQ/S. 96053/1/3/ASR.
খ. Letter No. B/50615/SURAJ, dated May 16, 1986.
গ. A telex message dated March 7, 1986.
ঘ. Letter No. EQ/106 dated March 8, 1986.
ঙ. Letter No. 3284 dated August 12, 1985.

সুইডিশ রেডিও-র মতে শ্রীচাড্ডা একজন সুপরিচিত অস্ত্র-দালাল। উপদেষ্টা বা কনসালট্যান্ট হিসেবে বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে তিনি নিয়মিত প্রাপ্য পেয়ে থাকেন। বোফর্সের সঙ্গে ভারতের চুক্তি সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রীচাড্ডা দিল্লীর এক বিলাসবহুল হোটেলে খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন—এই খবর সুইডিশ রেডিও-র। পরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে খানাপিনার আয়োজনের ছবিও প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেছে শ্রীচাড্ডার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট ছ'টি কোম্পানি—দু'টি সংস্থা তাঁর নিজের সম্পত্তি। দু'টির একটি হ'ল 'অ্যানাট্রনিক জেনারেল করপোরেশন'। এই সংস্থাই এদেশে বোফর্স কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

*　　　　*　　　　*

শ্রীচাড্ডা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ আমরা উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করি, প্রতিনিধি বা এজেন্ট নই। এজেন্টরা কমিশন পায় যেটি পণ্য-দামের কিছু অংশ মাত্র। ভারত সরকার এজেন্ট এবং প্রতিনিধির মধ্যে ফারাক কিছু দেখেন না—এরা সবাই সরকারের চোখে দালাল মাত্র।[৪]

সাক্ষাৎকারে শ্রীচাড্ডা মূল প্রশ্নের চটপট জবাব দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। 'আমি দালাল হিসাবে কাজ করি না। আমার হাত দিয়ে উৎকোচ বা ফালতু টাকা পাচার করা হয়নি। এসব কাজ আমার বিবেক ও নীতির বিরোধী। এমন নোংরা কাজে আমি অংশীদার নই'।

শ্রীচাড্ডা ধ'রেই নিয়েছেন যে বোফর্স সংক্রান্ত গোলমাল থেকে শেষ পর্যন্ত কিছুই বেরিয়ে আসবে না। যে সব অভিযোগ উঠেছে তার কোনোটাই সত্যি বলে প্রমাণ করা যাবে না। বোফর্স কোম্পানির উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর কাজ হ'ল কোম্পানির লোকেরা ভারতে এলে তাদের নানা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সাহায্য করা, রেল

৪. ইণ্ডিয়া টু-ডে, ১৫ মে, ১৯৮৭।

বা প্লেনের টিকিট জোগাড় ক'রে দেওয়া, বাসস্থান খুঁজে দেওয়া বা হোটেলের সন্ধান দেওয়া, তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া—এসব কাজের দরুণ মাসে মাসে পারিশ্রমিক বন্দোবস্ত করা আছে। তাঁর নিজস্ব সংস্থা 'অ্যানাট্রনিক জেনারেল করপোরেশন' ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্থা প্রথমে বোফর্সের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করে, পরে উপদেষ্টা পর্যায়ে উন্নীত হয়।

*　　　　*　　　　*

চারজন সুইডিশ সাংবাদিকের এক গোষ্ঠী বোফর্সের ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান চালায়। এদের মধ্যে দুজন 'বোরজে রামডাহল' এবং 'ম্যাগনাস নিলসন' বিতর্কের সূচনার মূলে। তাঁদের মতে এম আর. এ. রাও নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সত্তর দশকে বোফর্সের প্রতিনিধি ছিল। শ্রীচাড্ডা আসার পর শ্রীরাও এই কাজ ছেড়ে দেন।

আবার 'ডাগেন্স নিহেটার' নামের এক সুইডিশ সংবাদপত্র বোফর্সের প্রতিনিধি হিসাবে উৎকোচ আদান-প্রদানে হিন্দুজা গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করেছে। হিন্দুজা পরিবার বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। সত্তর দশকে ইরাণের সঙ্গে বোফর্সের বাণিজ্যিক লেনদেন হবার সময়ে মধ্যস্থ হিসাবে ছিল এই হিন্দুজা গোষ্ঠী। হিন্দুজা পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে যোগ রয়েছে 'মার্টিন আর্ডোবো'-র, যিনি বোফর্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান। শ্রীআর্ডোবো বোফর্সের চুক্তির সময়ে ভারতে ছিলেন। এই সব কাহিনী ১৯৮৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে সুইডিশ সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশ পেয়েছিল।

এই সঙ্গে স্মরণীয়, সুইডেনের সরকারী কৌঁসুলি (পাবলিক প্রসিকিউটার) 'লারস্ রিংবার্গ'-এর তদন্ত কাহিনী। রিংবার্গ গত বছরের শেষ দিকে (১৯৮৭) বোফর্স কেলেঙ্কারীর তদন্ত শুরু করেন। তিনি 'মার্টিন আর্ডোবো'-র ভারতে অবস্থানকালীন

সময়কার ডায়রী দেখেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৫] এই চুক্তির সময়কার নিত্যদিনের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা ডায়রীতে একটি সংক্ষিপ্ত নামের উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়—নামটির আদ্যক্ষর হিসেবে কেবল 'এইচ' কথাটি রয়েছে। এই 'এইচ' নামের ব্যক্তিটি বিলেতে থাকেন। চুক্তির ব্যাপার নিয়ে বারবার 'আর্ডোবো' 'এইচ' ব্যক্তিটির সঙ্গে পরামর্শের জন্য বিলেত গেছেন। অনেকের মতে 'এইচ' হলেন ব্যবসায়ী হিন্দুজা পরিবারের কেউ।

শ্রীচাড্ডার সঙ্গে বোফর্সের এখনও যোগাযোগ রয়েছে, অর্থকরী সম্পর্ক বজায় রয়েছে, তিনি তা স্বীকার করেন। বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে পান মাসে দুলাখ টাকা। শ্রীচাড্ডা এখন দেশ থেকে পলাতক। গোলমাল চলাকালীন অবস্থায় ভারত সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোনোভাবেই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি। চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দিয়ে গোপনে আমেরিকায় রয়েছেন। ভারত সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে চাড্ডা পরিবারের নাগাল প্যান নি। পরে, সন্ধান পাওয়ার পরেও ভারত সরকারের অনুরোধে মার্কিন কর্তৃপক্ষ শ্রীচাড্ডার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ দেন নি। পরে অবশ্য দিয়েছেন রাজীবজীর আমেরিকা ভ্রমণের পর।

সুইডিশ জাতীয় অডিট ব্যুরো পরিষ্কার ঘোষণা করেছে চুক্তি অনুযায়ী বাজারের নিয়মনীতি মেনেই কোম্পানি তাদের দেয় টাকা বিতরণ করেছে। কাজটা ছিল পণ্যের জন্য বাজার খুঁজে দেওয়া ও বেচাকেনায় সাহায্য করা, ইংরাজীতে মার্কেটিং। এই ধরনের কাজকে শ্রীচাড্ডা কমিশন এজেন্ট বা দালালের কাজ নয় বলে জানিয়েছেন।

* * *

উৎকোচ দেওয়ার কথা বোফর্স কোম্পানি কোনো মতেই স্বীকার করতে রাজি নয়। ফালতু টাকা কিছু দেওয়া হয়েছে বটে,

৫. বর্তমান, ২৭ জানুয়ারী ১৯৮৮। অরুণ শৌরি লিখিত নিবন্ধ।

অস্বীকার করার উপায় নেই—সুইডিশ জাতীয় অডিট ব্যুরোর পরীক্ষা থেকেই তা বেরিয়ে আসে। তাঁদের মতে ওই লেনদেন কোনো মতে দালালি হিসাবে কোনো মধ্যস্থ সংস্থার প্রাপ্য হয়নি। যা দেওয়া হয়েছে মধ্যস্থ সংস্থাকে সেটি ভারত-বোফর্স চুক্তি মতো তাদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজকারবার গুটিয়ে নিতে হচ্ছে বলে খেসারত—ইংরাজীতে 'ওয়াইন্ডিং আপ চার্জেস'।

ভারতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর উপদেষ্টার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। বোফর্স কোম্পানির বক্তব্য হ'ল, ১৯৮৫ সাল থেকে যখন ভারতে কামান কেনার প্রসঙ্গ ওঠে তখন ভারত-বোফর্স চুক্তি মতো কমিশন এজেন্ট সংস্থাগুলির কাজ ফুরিয়ে যায়। এরা বিক্রির ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেনি, বা করতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তী কালে এদের কাছ থেকে যে সব কাজ নেওয়া হয়েছে তা কেবল এদেশে আসা কোম্পানির লোকজনদের প্রয়োজনে দেখাশুনা করা। বোফর্স কোম্পানি শ্রীচাড্ডাকে এক মস্তো সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও শ্রীচাড্ডা পরিবার সমেত মার্কিন মুলুকে পলাতক।

ভারতে কামান বিক্রির কারণে বিশেষ আনুষঙ্গিক ব্যয়টি যা হয়েছে বোফর্স কোম্পানি তা অস্বীকার করেনি। তবে সেটি উৎকোচ বা দালালি নয় ব'লে ঘোষণা ক'রেও কোন কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে এ-সব দেওয়া হয়েছে প্রকাশ্যে সে সবের নামগুলি জানাতে অস্বীকার করেছে। এ-সব খবর প্রকাশ করা অন্যায় বলে তাঁরা মনে করেন—এগুলি নাকি ব্যবসায়িক গোপনীয়তার অঙ্গ।

বোফর্স কোম্পানির এই বক্তব্য সুইডেনের জাতীয় হিসাব রক্ষা পর্ষদ মোটেই স্বীকার করে না। তাঁদের মতে, সুইডেনের আইনে ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষার কোনো সুযোগ নেই। এই বক্তব্য বোফর্স কোম্পানি মেনে নেয়নি এবং ভারতের সঙ্গে অস্ত্র বাণিজ্যে অপ্রকাশিত তথ্যগুলি প্রকাশ করার জন্য কোনো অনুসন্ধানেও রাজি হয়নি।

ব্যবসায়িক গোপনীয়তা নষ্ট হবে বলে বোফর্স কোম্পানি

স্বদেশের জাতীয় হিসাব পরীক্ষা পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি বলেই অভিযোগ। তবে তথ্য গোপন করার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা বেআইনি লেনদেনকেই সামনে এনে দেয়। অডিট ব্যুরোর রিপোর্টে যে অংশে উৎকোচ প্রাপক কোম্পানিগুলির নাম থাকার কথা সেখানে শূন্যস্থান রেখে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় অডিট সংস্থা যখন এরকম একটি অসম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে তখন বুঝতে হবে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করার বাসনা সুইডিশ সরকারেরও নেই।

*　　　　*　　　　*

প্রকাশিত প্রাথমিক খবরগুলি থেকে অনুমান করা যায় কামান বেচাকেনায় শ্রীচাড্ডা একমাত্র সুবিধা প্রাপক ব্যক্তি নন—আরো কিছু সংস্থা রয়েছে। কামান ছাড়াও কামান বহনকারী শকটের সঙ্গে অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের অস্তিত্ব রয়েছে, যেগুলির নির্মাতা বা সরবরাহকারী বোফর্স কোম্পানি নয়। সরঞ্জাম বহনকারী যানটি যে কোম্পানি সরবরাহ করে তার এজেন্টও এক ভারতীয় সংস্থা। সুইডেনের 'সাবস্ক্যানিয়া' নামের সংস্থা এই বহনকারী শকটের নির্মাতা।

ভারতীয় সংস্থা 'কনফর্ড ইন্‌টারন্যাশানাল' 'সাবস্ক্যানিয়া' কোম্পানির ভারতীয় এজেন্ট। 'কনফর্ড' সংস্থার প্রধান হলেন শ্রীবিনোদ খান্না। দিল্লীর উঁচু মহলে পরিচিত ব্যক্তি। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'কনফর্ড ইনটারন্যাশানালে'র অফিসে আয়কর বিভাগের হানা দেওয়ার খবর রয়েছে। এদের অফিস থেকেও বোফর্স চুক্তি সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায় ব'লে খবর প্রকাশিত হয়েছে।[৬] বোফর্স নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক গজিয়ে উঠলে বিনোদ খান্না ও তাঁর ভাই সেনাবিভাগের অবসর-প্রাপ্ত উচ্চ বিভাগের কর্মী বিপিন খান্না চাড্ডা পরিবারের মতো দেশ ছাড়া হ'য়ে গেলেন।[৭]

৬. দ্য উইক, ৩-৯ মে, ১৯৮৭।

৭. তদেব।

আরো কিছু কিছু সংস্থার দপ্তরে আয়কর বিভাগের হানা দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। এঁদের কেউ কেউ বিদেশের অস্ত্র-কারবারীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। মজার ব্যাপার হ'ল, এই সব সংস্থায় প্রধান প্রধান পদে সেনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ ঘটে। জাজোদিয়া পরিবারের এ-রকম একটি ব্যবসা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানী সংস্থা সি বি আই-এর হানাদারিতে কিছু সরকারি গোপন দলিলের সন্ধান পাওয়া যায়।[৮] জাজোদিয়া গোষ্ঠী বিদেশী কোম্পানির ভারতীয় দালাল—এঁদের সংস্থায় দু'জন লেফ্টেনান্ট জেনারেল, একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্নেল কাজ করেন ব'লে জানা যায়।

যতদূর জানা গেছে থাপার পরিবার ভারতের সবচেয়ে বড় অস্ত্র-কারবারী। এঁদের পরিচালিত কোম্পানি 'গ্রীভস কটন' ব্রিটিশ ও ইতালীয় ফার্মের সঙ্গে যুক্ত। কমপক্ষে ত্রিশটি সামরিক পণ্য-সাজসরঞ্জামের আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে এদের সম্পর্ক রয়েছে—কমিশন এজেন্ট হিসেবেই এঁরা কাজ করে থাকেন।

বিড়লা পরিবারের একটি সংস্থা রয়েছে—'ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিক'। এঁরা জার্মানীর এম বি বি সংস্থার ভারতীয় এজেন্ট। এম বি বি সংস্থা বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুতকারক। ব্যোমযানে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক কলাকৌশল সম্পর্কিত যন্ত্রাদির প্রস্তুতকারক ব্রিটিশ কোম্পানি ফেরান্টি (FERRANTI) সংস্থারও ভারতীয় এজেন্ট 'ইউনিভার্সাল ইলেকট্রিক'।

ভারত-সরকার বারবার অস্বীকার করলেও জার্মান ডুবোজাহাজ কেনার ব্যাপারে দালাল গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সরকারী স্তরেই ঘোষিত হয়েছে। ভারতীয় লোকসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটির একাধিক প্রতিবেদনে সামরিক পণ্য ক্রয়ে দালাল নিয়োগের ঘটনা স্বীকৃত হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স রিভিয়ু নামের একটি আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৮৬) বেশ কয়েকটি ভারতীয় অস্ত্রদালাল

---

৮. তদেব।

সংস্থার নাম পাওয়া যায়। এগুলি হল ঃ অ্যানাট্রনিক জেনারেল করপোরেশন, গ্রীভস্ কটন, ইউরেকা সেলস্ করপোরেশন, রোজার এনটারপ্রাইজ, ইণ্ডিয়ান এয়ারোট্রনিকস্। অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসেবে আন্তর্জাতিক তালিকায় এদের নাম লিপিবন্ধ। ভারতে এদের ব্যবসা রয়েছে, অথচ ভারতীয় সামরিক বিভাগের সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই, এমন ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করা যায় কি ?

তাছাড়াও সাম্প্রতিক কালের লোকসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটির একাধিক রিপোর্টে প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় অস্ত্র দালাল সংস্থাগুলি সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য স্থানান্তরে আলোচিত হয়েছে। বোফর্স সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যে উইন চাড্ডা ও খান্না ভ্রাতৃদ্বয়ের দেশ ত্যাগ সরকারী ঘোষণাকে মিথ্যা ও অবাস্তবতার পর্যায়ে এনেছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত অস্ত্রদালাল সংস্থা ১৯৮০ সালের পরেও সরকারী কাজকর্মে অংশ নিয়েছে তার নানা নিদর্শন বিভিন্ন সংবাদে ছড়িয়ে রয়েছে।

বোফর্স সংক্রান্ত ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ঘোষিত টাকার অংক ৩১৯০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার দালালি হিসাবে একাধিক সংস্থা পেয়েছে ব'লে অনুমানটি এড়ানো শক্ত—অপ্রকাশ্য আরও কী পরিমাণ রয়েছে এখনো তা জানা যায়নি। স্বদেশে অভিযুক্ত ইরাণে অস্ত্রপাচার কেলেঙ্কারীর নায়ক বোফর্স কোম্পানির স্বীকারোক্তি কতো দূর যেতে পারে তা অনুমান করাই কঠিন। এ পর্যন্ত বলা যায় যে, স্বীকারোক্তির প্রকাশ্য অংশটুকু জলে ভাসমান বরফ খণ্ডের ওপরের অংশমাত্র যার বেশি অংশটাই রয়ে গেল জলের তলায় লোকচক্ষুর আড়ালে।

* * *

আন্তর্জাতিক মারণাস্ত্রের বাজারে দালালরা কী ধরনের অপকর্ম ঘটিয়ে থাকে তার অজস্র ঘটনা রয়েছে। শুধু টাকা ছড়ানো নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এদের মাথা গলানোর কথাও জানা যায়।

বিশ্ববাজারে অস্ত্রদালালদের চূড়ামণি ছিলেন স্যার বেসিল জাহারোফ। তাঁর অজস্র কীর্তি কাহিনীর কথা জানা যায়, যিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বেশ্যা বাড়ির দালাল হিসেবে, কিন্তু শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিশ্বের সেরা অস্ত্র দালাল হিসেবে। স্যার জাহারোফ তাঁর শেষ জীবনে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে খ্যাত হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে অস্ত্রদালাল হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয়—মৃত্যুকালে (১৯৩৬) তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩০০ কোম্পানির পরিচালক গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন।

তিনশো কোম্পানিতে তাঁর লগ্নি ছিল, কোনোটি যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদক, কোনোটি ব্যাঙ্ক বা রেল কোম্পানি, লগ্নি সংস্থা, হোটেল, জাহাজ প্রস্তুতকারক সংস্থা, খনিব্যবসা, কী ছিল না তাঁর অর্থ-নৈতিক অধিকারের মধ্যে। অধিকাংশ কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব ছাড়াও তিনি এজেন্ট বা দালাল হিসেবে অংশ নিয়েছেন। অস্ত্র ব্যবসায়ে যতরকম অ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে চালু রয়েছে তার সব ক'টির জনক স্যার বেসিল জাহারোফ। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে যে ইনি কেবল রাষ্ট্রীয় সম্মান 'নাইটহুড' লাভ করেছিলেন তা নয়, মৃত্যুর সময়ে হিসেব নিয়ে দেখা গেল তাঁর ঝুলিতে ৩১টি দেশের সম্মান রয়েছে।

অস্ত্রের বাজারে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি নর্ডেনফেল্ট কোম্পানিতে। এই কোম্পানি তখন সেরা মেসিনগান উৎপাদক। ১৮৭০-এ অস্ত্রের বাজারে জাহারোফের প্রথম পরিচয় ঘটে, বিদায় নেন ১৯৩৬ সালে—আমৃত্যু আন্তর্জাতিক অস্ত্রের বাজারে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। বিশ্বের নানা ভাষা তাঁর কন্ঠস্থ ছিল। জন্ম গ্রীস দেশে কিন্তু পদবী রুশীয়, মৃত্যু যখন হয় তখন তিনি ফরাসী নাগরিক কিন্তু ব্রিটিশ নাইটহুড উপাধি পেতে তাঁর অসুবিধে হয়নি।

দেশে দেশে বিভিন্ন কোম্পানির যুদ্ধাস্ত্র বেচার কাজে কোটি কোটি টাকা উৎকোচ হিসেবে বিলিয়েছেন এবং দেশ বিদেশের রাজনীতিতে গোপন হস্তক্ষেপে মারাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

যুদ্ধরত দুপক্ষকেই অস্ত্র জুগিয়েছেন বহুক্ষেত্রে। স্যার জাহারোফের কূটনৈতিক কলাকৌশল এখন মার্কিন সি আই এ-র দখলে। বিশ্বের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা তাঁর বন্ধু ছিলেন। লয়েড জর্জ, ক্লেমেসোঁ, গ্রীক প্রধানমন্ত্রী ইলিউথেরিওস ভেনিজেলোস, এমন কি হিটলার পর্যন্ত। বিশ্বের সেরা অস্ত্র উৎপাদক জার্মানীর ক্রুপস্, ভাইকার কোম্পানির চার্লস ক্র্যাভান অস্ত্রদালাল স্যার জাহারোফের পরামর্শমতোই চলতেন। ভাইকার কোম্পানির প্রধান অস্ত্র বিক্রেতা ছিলেন তিনি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ বছর ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত উন্নত ধরনের মেসিনগান বিক্রেতা হিসেবে ভাইকার কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এর মূলে ছিলেন জাহারোফ। অস্ত্র বাজারে জাহারোফের হাতেখড়ি নর্ডেনফেল্ট কোম্পানি থেকে একথা আগেই বলেছি। নর্ডেনফেল্ট ইন্ডো-সুইডিশ কোম্পানি। সারা ইউরোপ জুড়ে নর্ডেনফেল্টের বাজার ছিল।

মার্কিন অস্ত্র নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিম উন্নত ধরনের মেসিনগান নির্মাণ করলে জাহারোফ তাঁকে নর্ডেনফেল্ট কোম্পানির মধ্যে টেনে আনেন, পরে এই যুগ্ম সংস্থা ভাইকার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। জাহারোফ হলেন ভাইকার কোম্পানির প্রধান অস্ত্র বিক্রেতা।

জাহারোফের কৌশলে যুদ্ধাস্ত্রের বাজার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কামান, মেসিনগান, রাইফেল, রিভলভার, হাতবোমা, মাইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাইকার কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে চলে আসে। অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারটি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। অবশ্যই কূট-কৌশল ও তঞ্চকতার অভাব ছিল না। ফলে যুদ্ধরত দুপক্ষকেই জাহারোফ অস্ত্র সরবরাহ করে গেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক ছিল জার্মান পক্ষে। মিত্র-পক্ষীয় রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও যুদ্ধ শত্রুর মুখে সেই তুরস্ককেই তিনি মেসিনগান জুগিয়েছিলেন, যেগুলি বৃটেনে উৎপাদিত। এই অস্ত্র দার্দানেলিসের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত

হয়েছিল যে পক্ষের প্রধান হাতিয়ার আবার জাহারোফের সরবরাহ করা। বুয়র যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল, বিদ্রোহী বুয়র সেনা আর ব্রিটিশ সেনা মুখোমুখি যেসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধরত তাদের সবকটাই জাহারোফ প্রেরিত।

পূর্ব ইউরোপে বল্কান দেশগুলির আত্ম সংঘর্ষে জাহারোফ জড়িত ছিলেন। এখন সংঘর্ষময় দুনিয়ায় যেমনভাবে মার্কিন সমরবাদী অর্থনীতি ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশ বিশ্বময় ছড়িয়ে মারণাস্ত্রের বাজার তেজী করে রেখেছে আগে একা জাহারোফ ক্ষুদ্রতর পরিবেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘর্ষময় পরিস্থিতি জিইয়ে রাখায় সফল হয়েছিলেন। নানাভাবে তিনি যুদ্ধের ইন্ধন জোগাতে পারতেন। এক সময়ে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্রীসকে সমর্থন করেছিলেন। আবার গ্রীসের বিরুদ্ধে সার্বিয়াকে অস্ত্র জুগিয়েছিলেন। পরে আবার সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়েছিলেন। অস্ত্র দালাল হিসেবে কোনো নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয় রাখেন নি। অস্ত্রের বাজারে প্রচুর পরিমাণে ঘুষের ব্যবহার চালু করায় তাঁর জুড়ি ছিল না। সেই ঐতিহ্য সমানে চলে আসছে।

শোনা যায় একবার গ্রীসকে একটি সাবমেরিন বিক্রি করার পর গ্রীসের বিপক্ষ তুরস্ককে প্ররোচিত ক'রে দুটি সাবমেরিন কিনতে বাধ্য করেন। পরে রাশিয়ার জারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাশিয়ার দক্ষিণ দেশগুলির অর্থাৎ গ্রীস ও তুরস্কের মারাত্মক নৌশক্তি অর্জনের কথা জানিয়ে দিয়ে চারটি সাবমেরিন কিনতে প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন। এই জাহারোফের কলা কৌশল এখন মার্কিন সমরবাদী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের হস্তগত।

* *

সাম্প্রতিক যুদ্ধাস্ত্রের বাজারে অস্ত্র দালাল হিসাবে অ্যাডনান খাসহোগ্গি সম্ভবত সবচেয়ে ধনী। তিনি সৌদি আরবের মানুষ।

আন্তর্জাতিক বাজারে এতো দ্রুত উত্থান সম্ভবত আর কারুর হয়নি। বর্তমান বিশ্বে অস্ত্র সংগ্রহে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এবং নতুন নতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবনার সুযোগে অস্ত্র বাজারের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তার সুযোগ খাসহোগ্গি নিজ দখলে আনতে পেরেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে তৃতীয় বিশ্বের অস্ত্র কেনার প্রতিযোগিতায় একটা বড়ো অংশ রয়েছে খাসহোগ্গির এক্তিয়ারে।

মধ্য এশিয়ার আরব দেশগুলি এখন মারণাস্ত্র দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক। এই দুনিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ এখন খাসহোগ্গির একচেটিয়া, বিশ্বের অন্যতম সেরা সামরিক সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদক লকহীড কোম্পানির অস্ত্র বিক্রেতা হিসাবে খাসহোগ্গি দুনিয়ায় পরিচিত হন। লকহীড কোম্পানীতে শেষ জীবনে যুক্ত ছিলেন স্যার জাহারোফ। মারণাস্ত্র বাজার কীভাবে নানা কলা কৌশলে উৎকোচ আর উপহার দিয়ে দখলে রাখতে হয় লকহীড কোম্পানি তার সবগুলি পদ্ধতি কাজে লাগায়। একদা হল্যান্ডের সিংহাসনারূঢ়া রানীর স্বামী প্রিন্স বার্নহার্ড লকহীড কোম্পানির কাছ থেকে একটি বিমান উৎকোচ গ্রহণ করার পর ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই লকহীড কোম্পানির জোয়ালে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার পর খাসহোগ্গি অস্ত্র বাজারের কূট কৌশল আয়ত্তে আনতে দেরী করেনি।

লকহীডের মারফৎ অস্ত্র বাজারের গোপন চোরাপথগুলি তাঁর চেনা হয়ে যায়। শুরু হয়েছিল সৌদি আরবের অস্ত্র সংগ্রহের জিদ থেকে। সৌদি আরবের রাজসিংহাসনের অধিকারী প্রিন্স ফাদ এবং রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি প্রিন্স সুলতান দুই ভাই খাসহোগ্গির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহপাঠীও বটে। খনিজ তেলের কাঁচা টাকায় হঠাৎ বড়লোক মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সৌদি আরব এখন সবচেয়ে সেরা মারণাস্ত্র ক্রেতা—অতএব খাসহোগ্গির প্রাথমিক উত্থান যেমন দ্রুত তেমনি চমকপ্রদ। মারণাস্ত্রের কল্যাণে মার্কিন উচ্চমহলে খাসহোগ্গির যোগাযোগ সহজতর হ'য়ে ওঠে।

প্রথম জীবনে খাসহোগ্গি ব্রিটিশ সংস্থা রোলস রয়েস আর মার্কনী কোম্পানিতে হাত পাকিয়েছিলেন। দুটো-ই যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ তৈরী করে থাকে। পরে লকহীড কোম্পানির সংস্পর্শে আসেন। ইউরোপের অস্ত্র বাজারের কূট কৌশলের খোঁজ তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি কীভাবে বাড়ানো যায়, কী ভাবে যোগাযোগ ঘটানো যায়, কাকে উৎকোচ দিলে কাজ হাঁসিল হয় এসব বিদ্যা অর্জন করতে মোটেই বেশি দেরী হয়নি। খুবই তৎপরতার সঙ্গে অস্ত্র বাজারের প্রভাবশালী বিক্রেতারূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে অত্যন্ত দ্রুত।

খাসহোগ্গির কর্মজীবনে প্রবেশ ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৭ সালে নিজস্ব সংস্থা ট্রায়াড-এর পত্তন করেন। ব্যবসার লাইসেন্স সংগ্রহ করলেন লিক্‌টেনস্টাইন রাষ্ট্র থেকে। লিক্‌টেনস্টাইন দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশগুলির অন্যতম কিন্তু চোরা-চালানী কালো টাকার সংরক্ষক হিসাবে, অন্যতম শীর্ষস্থানাধিকারী। সুইজারল্যান্ডের মতো গোপন অর্থের সংরক্ষক রাষ্ট্রের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী দেশ লিকটেনস্টাইনকে সমীহ করে চলে। বিশ্বের কর ফাঁকিদাতাদের স্বর্গ সুইজারল্যান্ডের কর ফাঁকিদাতারা লিক্‌টেনস্টাইনে গিয়ে গোপন টাকার সম্পদ উজাড় করে দেয়। এই হিসাবেও এই রাষ্ট্রটি একেক সময়ে সুইজারল্যান্ডের বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে।

কয়েক বছর গোপন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে খাসহোগ্গি এমন একটি দেশ থেকে ব্যবসার জাল বুনে দেশে দেশে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে হাত পাকিয়ে এবং সৌদি আরবের রাজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখায় তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষার গোপন দপ্তর পেন্টাগণে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছেন। মার্কিন পেন্টাগণ থেকে অস্ত্র দুনিয়ায় কীভাবে উৎকোচ বিলানো হয় এসব থেকেও তাঁর শিক্ষা অধিগত হয়েছে।[৯] কীভাবে ক্রেতার প্রদেয় অর্থ থেকে উৎকোচের টাকা

৯. Anthony Sampson : Arms Bazar, পৃ. ১৯৩।

সংগ্রহ করে ওই টাকাই ক্রেতার হাতে গঁুজে দিতে হয় এসব কান্ড-কারখানার জ্ঞান মার্কিন পেন্টাগণের কাছ থেকেই তাঁর পাওয়া। **ঠিক এই ব্যাপারটাই ভারতে বোফর্স কোম্পানি কামান সরবরাহ মারফৎ বাজিয়ে নিয়েছে—মাছের তেলে মাছ ভাজা।**

ষাটের দশক শেষ হবার আগেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে খাসহোগ্গি মাথা গলাতে পেরেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে ঠিক দ্বিতীয় জাহারোফের আবির্ভাব খাসহোগ্গির চরিত্রে। এমন কি মার্কিন রাজনীতির উচ্চতম স্তরে খাসহোগ্গির প্রবেশ চমকপ্রদ।

রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে ষাটের দশকের শেষে। খাসহোগ্গির চেষ্টায় আরব দুনিয়ায় রাষ্ট্রপতি নিকসন আরব দরদী হিসাবে গৃহীত হন। নিকসনের প্রথম নির্বাচন প্রচারে খাসহোগ্গি টাকা ঢালতে পিছিয়ে যান নি। প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর পূর্বসূরী প্রেসিডেন্ট জনসনের আরব বিদ্বেষের পথ থেকে সরে আসেন খাসহোগ্গির প্ররোচনায়, এমন সাক্ষ্য দুর্লক্ষ্য নয়।[১০]

শোনা যায় ১৯৭২ সালে নিকসনের নির্বাচনী প্রচারে খাসহোগ্গি দশ লক্ষ ডলার জুগিয়েছিলেন এবং আরবীয় উৎস থেকে নিকসনের ভান্ডারে যে এক থেকে দেড় কোটি ডলার আসে—সেই চেষ্টার পেছনেও খাসহোগ্গি।[১১]

ওয়াটারগেট মামলায় খাসহোগ্গি অন্যতম সাক্ষ্যদাতা ছিলেন। এই মামলায় তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে নিকসনের ভান্ডারে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হয়েছে। ভবিষ্যৎ ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক প্রভাব অটুট রাখতে হলে দালালি যার পেশা তাকে দুপা এগিয়ে এসে এক পা পিছিয়ে যেতে হয়। খাসহোগ্গিও তাই করেছেন, নিকসনকে বাঁচানো যাবে না দেখে বিপরীত পথে পা

---

১০. অদেব, ১৯৫।
১১. অদেব, ১৯৬।

বাড়াতে কসুর করেন নি। মার্কিন অস্ত্র বাজারে প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে গোপন পথের ব্যক্তিটিও রেখে ঢেকে গোপন কথার কিছুটা প্রকাশ করেছেন—নইলে বাজারে টেকা যায় না।

এই খাসহোগ্গি ভারত-বোফর্স চুক্তির ব্যাপারে অংশ না নিলেও উৎকোচ লেনদেনের ঘটনা স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেছেন।[১২]

১২. ইন্ডিয়া টু-ডে, মে ১৯৮৭।

টাকার চোরাচালান ও সুইজারল্যাণ্ড

সম্ভবতঃ বিশ্বে সবচেয়ে দামী বইটির মূল্য হ'ল ছ'হাজার ডলার। আমাদের এখনকার টাকার মূল্যে ৭৮ হাজার টাকা। বেরিয়েছে প্যারিস থেকে, ইংরেজি ভাষায় লেখা। নামঃ Tax Haven Selection, Use and Profits। সরকারের প্রাপ্য কর ফাঁকি দিয়ে বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে স্বদেশের মুদ্রা গোপনে চালান দিয়ে কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখা যায়, সেই দেশ ও অঞ্চল-গুলিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ এবং এই সব রাষ্ট্রে বেআইনী সম্পদ সঞ্চয়ে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় এবং লাভই বা কি, সে সম্পর্কে তথ্য সঙ্কলন করা হয়েছে বইটিতে। বলা বাহুল্য বইটির বিশেষ শ্রেণীর ক্রেতা রয়েছে সারা বিশ্বে, উপযুক্ত মূল্য দিয়ে যারা বইটি কিনে নিতে পারে।

বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকৃতি যত বাড়ছে এই ধরনের চোরাচালানী সম্পদের কেন্দ্রস্থলের সংখ্যাও বাড়ছে। সহজ পথে হাঁটার ক্ষমতা এখন বিশ্ব ধনতন্ত্রের নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে চোরাচালানী সম্পদের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বৃহৎ ধনতন্ত্রের দেশগুলিও এ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। কারণ ঐ সব রাষ্ট্রেও এখন সম্পদের টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক সঙ্কট যতই বাড়ছে—টাকার চোরা-চালানী কাজকর্মও তত বেড়ে চলেছে। ফলে চাহিদায় সারা বিশ্বে সুইজারল্যান্ড-সহ প্রায় দু'ডজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র রয়েছে, যে অঞ্চলগুলি চোরাচালানী টাকার সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, একদা যেগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে নৌ-দস্যুদের গোপন সম্পদ সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থল ছিল, এখন বিশ্ব-ধনতন্ত্রের গোপন পুঁজির আস্তানা হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

চোরাচালানী গোপন পুঁজির আস্তানা হিসাবে অঞ্চলগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে

প্রথম ভাগে পড়ছে সেই সব অঞ্চল, যেগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর মানুষজনকে কোনো কর দিতে হয় না—না আছে আয়কর, কোম্পানিকর, বা সম্পদকর, উত্তরাধিকার কর কিংবা দান কর। অঞ্চলগুলি হল, বাহামা, বারমুডা কেম্যান আইল্যান্ড, নাউরু, নিউ হেব্রাইডেস, টার্কস এ্যান্ড কাইকোস।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ছে এমন সব অঞ্চল, যেগুলিতে যতকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ কর রয়েছে বটে যেমন আয়কর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি তেমনি বিশেষ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে বিদেশী পুঁজির বেলায়। অঞ্চলগুলি হল, অ্যাঙ্গুইলা, অ্যান্টিগুয়া, বাহেরিন, বার্বাডোস, বৃটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ক্যাম্পিওনে, সাইপ্রাস, জিব্রাল্টার, গুয়েনর্সি, আইল অফ ম্যান, জামাইকা, ইস্রায়েল, লেবানন, লিক্‌-টেনষ্টাইন, ম্যাকাও, মোনাকো, মন্ট-সেরাট, নেদারল্যান্ড অ্যান্টিলে, সেন্ট হেলেনা, সেন্ট ভিনসেন্ট, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ড।

তৃতীয় ভাগে যে দেশগুলি পড়ে সে-গুলিতে স্বাভাবিক কর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে বিশেষ কিছু কর ছাড়ের বন্দোবস্ত। দেশগুলি হল, লাক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ড, ফিলিপাইন। বৃটিশ যুক্তরাজ্যও এই দেশগুলির মধ্যে পড়ে। তৃতীয় পর্যায়ের দেশগুলির ব্যাঙ্কেও সঞ্চিত বিদেশী সম্পত্তির পরিমাণও যথেষ্ট।

* * *

তবে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গোপন সঞ্চয়ের কেন্দ্রগুলি আমাদের উল্লিখিত প্রথম দুটি বিভাগেই পড়ে। এগুলির অধিকাংশই দ্বীপরাষ্ট্র। এদের অধিকাংশই কিন্তু এককালের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, কয়েকটি এখনো ঔপনিবেশিকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রায় সবক'টি অঞ্চল বিদেশী পুঁজির স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে। এদের অনেকগুলি এখনও বৃটিশ অধিকারে। বৃটিশ শাসনে থাকলেও কর ও শুল্ক সংক্রান্ত আর্থিক স্বাধীনতা এই সব অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হয়েছে। ফলে চোরাচালানী টাকার কেন্দ্রস্থল হিসাবে এই সব দেশ এখন খ্যাতকীর্তি।

এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের খ্যাতি বা অখ্যাতি সবচেয়ে বেশি

এবং দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন। এখানে ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত আইন-কানুন চোরাচালানী সম্পদ সঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঞ্চিত টাকার ওপর সুদ দেওয়া হয় না বরং স্বল্পহারে 'সার্ভিস চার্জ' কেটে নেওয়া হয়—তা সত্ত্বেও সুইস-ব্যাঙ্কগুলিতে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা চালান হওয়ায় ঘাটতি পড়ছে না।

৬৪ লক্ষ মানুষের দেশ সুইজারল্যান্ডে মাথাপিছু বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মোট বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণে সুইজারল্যান্ডের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ফ্রান্সের পরে অবস্থান করলেও মাথা পিছু হিসাবে সবার ওপরে। নিচের সারণী দ্রষ্টব্য।

সারণী—১

রাষ্ট্র	বৎসর	মোট বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় (মিলিয়ন ডলার)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথাপিছু বিদেশী মুদ্রা (ডলার)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৮৬	১৮,৭৮৬	২৩৮	৭০
পশ্চিম জার্মানী	১৯৮৫	৩৯,০২৫	৬১	৬৩৯
জাপান	১৯৮৫	২২,৩২৮	১২১	১৮৬০
ফ্রান্স	১৯৮৫	২৪,৩১৯	৫৫	৪৪২
সুইজারল্যান্ড	১৯৮৫	১৭,৪৬৩	৬	২৯১০

উৎস : ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়া-ওয়ার্ল্ড ডাটা, ১৯৮৬

* * *

৬৪ লক্ষ মানুষের দেশ সুইজারল্যান্ড। আমাদের বৃহত্তর কোলকাতার জনসংখ্যা সুইজারল্যান্ডের থেকে বেশি। এমন একটি দেশে ১৭,৪৬৩ মিলিয়ন ডলার হল বিদেশী টাকায় সঞ্চিত, অর্থাৎ সতেরো হাজার চারশো তেষট্টি কোটি তিরিশ লক্ষ ডলার মূল্যের বিদেশী টাকা সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে ১৯৮৫ সালে সঞ্চিত ছিল—এই হল সরকারী হিসাব। মাথাপিছু হিসাবে

দাঁড়ালো ২৯১০ ডলার। সবচেয়ে বেশি বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় রয়েছে পশ্চিম জার্মানীতে কিন্তু মাথাপিছু সঞ্চয় ৬৩৯ ডলার।

সুইজারল্যান্ডে ভারতীয় চোরাচালানী টাকার সঞ্চয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে—এই মর্মে আন্তর্জাতিক সংবাদও প্রচারিত হয়ে চলেছে। বিদেশে গোপন সম্পত্তি রক্ষা ও বিদেশী মুদ্রার তছরুপ সংক্রান্ত কোটি কোটি গোপন টাকার অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে, তাদের একজন হলেন খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভ বচ্চন। অজিতাভ এখন সুইজারল্যান্ডবাসী—ব্যবসাসূত্রে সেখানেই রয়ে গেছেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য জার্মান ডুবোজাহাজ এবং সুইডেনের বোফর্স কোম্পানির কামান কেনার ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে সুইসব্যাংকও জড়িত আছে বলে সন্দেহমূলক সংবাদ রয়েছে—কিন্তু দুটি ব্যাপারেই ভারত সরকারের অনুসন্ধান তৎপরতার খবর মেলে নি।

জার্মান ডুবোজাহাজ সংক্রান্ত অভিযোগটিতে প্রতিরক্ষা বিভাগীয় তদন্ত বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু বোফর্স কামান ক্রয় সংক্রান্ত ঘটনায় কোটি কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে চালান দেবার কথা বোফর্স কোম্পানি সরাসরি অস্বীকার করেছে যদিও সুইডেনের জাতীয় রেডিও সংস্থার দেওয়া খবরে বোফর্স কোম্পানি থেকে সুইসব্যাংকে ভারতীয় আমানতকারীর নামে গোপনে টাকা জমা দেওয়ার সংবাদ ঘোষিত হয়েছে এবং সংবাদদাতার হাতে যথেষ্ট প্রমাণপত্র নথিসহ রয়েছে বলেই জানানো হয়েছে।

* * *

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে গোপন ভারতীয় খাতে সম্প্রতি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা গোপনে সঞ্চিত হয়ে চলেছে এমন তথ্য প্রথম সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার, ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের যে পুস্তকে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল তার লেখক বোনিডিক্টে ভাইব

ক্রুশ্চেনসন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সুইস ব্যাঙ্কে বছরে বছরে কত পরিমাণে ভারতীয় সম্পদ জমা পড়েছে সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে জানানো হয়েছে, এটাই সম্পূর্ণ হিসেব নয়। জলে ভাসমান বরফ স্তূপের ওপরের অংশমাত্র। চোখের আড়ালে রয়েছে বহুগুণিত গোপন সঞ্চয় দেশ বিদেশের ব্যাঙ্কে।

এই তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোকসভায় সেদিন তুমুল হৈচৈ ওঠে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সেদিন আশ্বাস দিয়েছিলেন সরকারী তরফ থেকে অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপরেও জার্মান ডুবো-জাহাজের ঘটনায়, বোফর্স কামানের ঘটনায়, অমিতাভ বচ্চনের ঘটনায় বিদেশে গোপন ভারতীয় সম্পদ সঞ্চয়ের আরো তথ্য প্রকাশ পায়। তারও আগে অবশ্য ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি মালিকদের বিদেশে গোপন সঞ্চয়ের তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল বিদেশে গোপন লগ্নির খবরে।

এই সব বৃহৎ ঘটনার পরে ভারত জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিলে এই সেদিন অত্যন্ত চাপে পড়ে ভারতের সরকারী দল সুইজারল্যান্ডে গিয়ে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সেরে ফিরে এসেছে—একবার নয়, দুবার। সরকারী তরফ থেকে খবরে জানানো হয়েছে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাকি বোঝাপড়া হয়েছে —ভারতীয় প্রতিনিধিরা প্রত্যাখ্যাত হন নি। সুইস কর্তৃপক্ষ বোঝাপড়ার জন্য একটি লিখিত স্মারকপত্র ভারত সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন।

একজন বিদেশীর চেষ্টায় সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে চোরা-চালানী ভারতীয় টাকার গোপন সঞ্চয়ের অসম্পূর্ণ তথ্যটি জানতে সেই বিদেশীকে সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিন্তু কোনো গোপন বোঝাপড়ায় আসতে হয়নি। প্রামাণিক গোয়েন্দা অনুসন্ধানে এই তথ্যটি সংগৃহীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার কর্তৃপক্ষ ভারত এবং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে যথাকালে সতর্ক করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু

ভারত সরকারের তরফ থেকে এর পরেও অনুসন্ধানে কোনো তৎপরতার কথা জানা যায় নি।

যে কোনো দেশ থেকে আগত চোরাচালানী পুঁজি সুইজারল্যান্ডে অবাধে প্রবেশের সুযোগ পায়। এ কাজে ওদেশে আইনগত কোনো বাধা নেই। কোনো দেশের অর্থনৈতিক আইন ভেঙ্গে এইসব টাকার আগমন ঘটছে কিনা সে সব অনুসন্ধানের দায়িত্ব সুইস কর্তৃপক্ষ নিতে চান না। অন্য দেশের কর ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে সে সব অপকর্ম প্রতিরোধের দায়িত্ব সেই সব দেশের। ক্ষতিগ্রস্ত দেশ তৎপর হলেই সুইস কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার অভাব হবে না। এমন বিস্তর ঘটনা সাম্প্রতিক সুইস ব্যাঙ্কের ইতিহাসে রয়েছে।

ক্লশেচনসনের বইতে ভারতীয় চোরাচালানী টাকার শেষ তথ্যটি ১৯৮৪ সালের। তার পরেও দুবছর কেটে গেছে—এই দুবছরে আরো কত কোটি ভারতীয় টাকা সুইস ব্যাঙ্কগুলিতে গোপনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে সে অনুসন্ধানে ভারত সরকার মোটেই আগ্রহ দেখান নি। অথচ সুইডেন থেকে, জার্মানী থেকে প্রামাণিক সূত্রে আরও খবর এলো ঘুষ ও দালালি বাবদ ভারতীয় টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে—এমন সব ঘটনার বিরুদ্ধে কেবল অপপ্রচারের অভিযোগ আনা হল। তদন্তের চেষ্টা হল না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে যে সংবাদ প্রচার করেছে, আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছে তা সম্ভবত দিল্লীর সরকারের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। বাঞ্ছনীয় হলে সেই নভেম্বর মাসেই খবরটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার ঝটিতি তৎপর হয়ে উঠতেন। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি যদিও সরকারী-ভাবে কয়েক হাজার কোটি বিদেশী মুদ্রা তছরুপের অভিযোগ ভারত সরকারের ঝুলিতে রয়েছে। আরো আশ্চর্যজনক খবর হল, ঐ নভেম্বর মাসেই বিদেশী সংক্রান্ত আইনে ছাড় দেওয়ার

ব্যবস্থা হল ঃ অপরাধী ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় অপরাধ কবুল করে সঞ্চিত বেআইনী বিদেশী সম্পত্তির কথা জানিয়ে দেয় তাহলে যৎকিঞ্চিৎ অর্থদন্ড দিলে আইনগত অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তি পাবেন—তাঁর বিদেশে সঞ্চিত গোপন সম্পত্তির স্বীকৃতির পরে আর কোনো অনুসন্ধান হবে না—সসম্মানে ছাড় পেয়ে যাবেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় এই ব্যবস্থায় শিল্পপতি রতন টাটা বিদেশে সঞ্চিত কোটি কোটি টাকার গোপন সম্পদ সঞ্চয়ের অভিযোগ থেকে ছাড় পেয়ে গেছেন, শিল্পপতি ললিতমোহন থাপার, রিলায়েন্স ইন্ডাষ্ট্রীর ধীরুভাই আম্বানিও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। অতএব ভারত সরকারের দায়িত্ব নেই সুইজারল্যান্ডে কোন্ কোন্ ভারতীয়ের কত গোপন সম্পদ রয়েছে সেই সব তথ্য অনুসন্ধান করে খুঁড়ে বের করা। যাদের গোপন বিদেশী সম্পদ রয়েছে তারাই স্বেচ্ছায় ভারত সরকারকে খবর দেবে কত কি ভারতীয় সম্পত্তি বিদেশে রয়েছে!

এই প্রত্যাশাতেই ভারত সরকার দায়িত্ব শেষ বলে ধরে নিয়ে এতোকাল দ্বিধাহীন মনে নিশ্চুপ ছিল। কিন্তু সারাদেশে বোফর্স কামান আর ঘুষ এবং দালালি নিয়ে বিশাল হৈচৈ রাজীব সরকারের রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নেয়। খবরে জানা গেছে, সুইডিশ রেডিও থেকে ঘুষের খবর প্রকাশিত হবার পর তিনটি রাতে ভোর পর্যন্ত দিল্লীর মন্ত্রিসভা উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক করেছে। শোনা গেছে যথাযথ অনুসন্ধানের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে অরুণ সিং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তারপরেই ঠিক হয় যে সুইজারল্যান্ডে নাম-কা-ওয়াস্তে প্রতিনিধি না পাঠালেই নয়।

সুইস কর্তৃপক্ষের অনুকূল আচরণের আভাস পেয়ে এখন একটি দীর্ঘকালীন কার্যক্রম নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে মাত্র—যে কার্যক্রম সাঙ্গ হলে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হতে পারে। কবে এই কার্যক্রম গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে গত চার মাসেও তা ঠিক হয়নি বলে খবর।

তবে দিল্লীর সরকার স্বেচ্ছা ঘোষণার নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ৬৭ কোটি ভারতীয় টাকার মূল্যে বিদেশী মুদ্রার হদিশ পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশিত তথ্য হোল কেবল সুইস ব্যাঙ্কেই ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ১৩৩২ কোটি টাকার ভারতীয় সম্পদ রয়েছে। কোথায় ৬৭ কোটি আর কোথায় ১৩৩২ কোটি। শেষোক্ত অঙ্কটি আবার প্রকৃত হিসাবে গোপন সম্পত্তির ভগ্নাংশ মাত্র বলে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের তথ্য হোল দিল্লীর মসনদে ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ফিরে আসার বছর থেকেই সুইস ব্যাঙ্কে দ্রুত হারে গোপন ভারতীয় সম্পদের সঞ্চয় শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে জমা ছিল ৭৮৮ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ ভারতীয় টাকায় যেটি ৩৭৮ কোটি টাকা। ওই বছরে জমা পড়ে ৭৪ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ কিন্তু ১৯৮০ সালে জমা পড়ে ২০৭ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ—পরবর্তী বছরে ১৮০ মিলিয়ন, ১৯৮৪-তে ৪৫২ মিলিয়ন যোগ হয়। চুরাশি সালে মোট পরিমাণ দাঁড়ালো ১৯৩৭ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ। বর্তমানে এক বেসরকারি হিসাবে অঙ্কটি বেড়েছে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর প্রথম বছরে ২৫০০ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ—ভারতীয় মুদ্রায় ১৩৩২ কোটি টাকা।

১৯৮০ সাল থেকে আকস্মিকভাবে সুইস ব্যাঙ্কে গোপন সঞ্চয় বাড়ার ঘটনা বাড়তি রহস্যের ইঙ্গিত বহন করে। এসব অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করার দায়িত্ব রাজীব সরকারের যেমন নেই তেমনি উদ্ধারের দায়িত্বও নেই। না হলে বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ না নেওয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য তিনরাত্রি মন্ত্রিপরিষদের শলা পরামর্শ করার প্রয়োজন হোত না। বোফর্স কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা ভারত ত্যাগের আগে ঘোষণা করে গেছেন—প্রধানমন্ত্রীকে কোনো ঘুষ দেওয়া হয়নি। এতো বড় সার্টিফিকেটটি পাওয়ার পরেও সুইস ব্যাঙ্ক থেকে গোপন সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে না কেন?

*   *   *   *

সুইজারল্যান্ডের এই অবস্থা সম্প্রতি গড়ে ওঠেনি। দু এক শতাব্দী ধরেই এমন কান্ড ঘটে চলেছে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও ইটালির সরকারের এ সম্পর্কে যথেষ্ট শিরঃপীড়া রয়ে গেছে। যে কোন সম্পন্ন ফরাসী নাগরিকের একটা সঞ্চয় সুইস ব্যাঙ্কে থাকবে—এ তথ্য ফ্রান্সের সরকারের অজ্ঞাত নয়। এমন কি বৃটিশ ব্যাঙ্কারদের অনেকের গোপন সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে বলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ শোনা গেছে।

ইটালি কর্তৃপক্ষের শিরঃপীড়াও আয়কর ফাঁকির ব্যাপারটি নিয়ে। কর ফাঁকি দিয়ে লাখ লাখ লিরা (ইটালিয় মুদ্রা) স্বদেশের সীমানা ডিঙিয়ে সুইস ব্যাঙ্কে জমা হয়—তবে একটা সান্ত্বনায় ইটালির সরকার নিশ্চুপ থাকেন, তা হল স্বদেশ থেকে চালানী টাকা শেষ পর্যন্ত ইটালিতেই শিল্প বাণিজ্যে পুঁজির আকারে ফিরে আসে। সুইজারল্যান্ড থেকে সারা য়ুরোপে শিল্প বাণিজ্যে ক্রমাগত পুঁজি চালান হয়ে চলেছে। সেই সূত্রেই আবার লাখ লাখ টাকার সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কে জমা হয়।

সুইস ব্যাঙ্কের সমস্যা নিয়ে ফ্রান্সের মাথাব্যথা কম নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। যুদ্ধ পরবর্তী ফ্রান্সের লিও ব্লুম-এর সরকারের নাকি পতন ঘটে সুইসব্যাঙ্কে ফ্রান্সের টাকা চালান প্রতিরোধ করতে গিয়ে। এক সময়ে ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল, খুব আঁটা-আঁটি বাঁধা-বাঁধুনি থাকার জন্যই সম্ভবতঃ ফরাসী মুদ্রার গোপন অভিসার সুইসব্যাঙ্ক অভিমুখে। ১৯৬৭ সালে ফরাসী অর্থমন্ত্রী মাইকেল ড্রেবে ফরাসী মুদ্রার সরকারি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল) লুপ্ত করে দেন। অর্থাৎ দেশ বিদেশের টাকা যেমন যথেচ্ছ হিসাবে ফ্রান্সে ঢোকার সুবিধে পাবে তেমনি ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঁ সরকারের বিনানুমতিতেই দেশের বাইরে চালান হতে পারবে। ফলে, সুইস ব্যাঙ্কে যে কোন ফরাসীর একাউন্ট খোলায় বাধা আর রইলো না। ব্যস শুরু হয়ে গেল বন্যার বেগে ফ্রান্সের মুদ্রার

পলায়ন, আশ্রয়স্হল সুইজারল্যান্ড। প্রায় বাঁধ ভাঙার মত অবস্হা। আরো জটিল পরিস্হিতির সৃষ্টি হয়ে যায় ১৯৬৮ সালে।

তখন ফ্রান্সে এক ধরনের বিপ্লবাত্মক পরিস্হিতি। কলকারখানা-গুলি ধর্মঘটের চাপে এক নাগাড়ে বন্ধ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠানবিরোধী তুমুল বিক্ষোভে সামিল। ফরাসী সরকারের ও প্রশাসনের লাগাম-ছাড়া অবস্হা। এমন পরিস্হিতি পেয়ে দেশ থেকে টাকা ও সম্পত্তির পলায়ন শুরু হয় অত্যন্ত মারাত্মক গতিতে। কর্তৃপক্ষের সব সহ্যের বাইরে চলে গেল পরিস্হিতি। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও দেশী বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন ফিরিয়ে আনতে হল।

যে স্বল্পকালীন সময়ে মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ ছিল না, জানা গেছে ঐ সময়টিতেও ফ্রান্স থেকে টাকার চালান যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গেই করা হোত। এই সময়ে ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে মোটর পথ ধরে যাতায়াত এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, সুইজারল্যান্ডের প্রবেশ পথের প্রধান সড়কটিতে বহু মাননীয় ব্যক্তির যান দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে।[১] ঐ পথে ফ্রান্স থেকে দ্রুত ধাবমান গাড়ির চলাচল অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। সেই একটি বছরে একশো কোটি ডলারের মত সম্পদ ফ্রান্সের হাতছাড়া হয়ে যায়।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী কাস্টমস বিভাগের হাতে সুইস ব্যাঙ্ক কর্পোরেশনের ফরাসী খদ্দেরদের একটি গোপন তালিকা চলে আসে। যিনি তথ্যসম্ভার জুগিয়েছিলেন তাঁকে আর স্বদেশে ফিরে যেতে হয়নি। ফ্রান্সে যাবজ্জীবন অত্যন্ত আরামের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগটুকু তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘটনায় সে-বার সতেরো হাজার নাম পাওয়া যায় এবং সরকারের ঘরেও বেশ কিছু ফাঁকি দেওয়া কর আইনমত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে

১. Nicholas Faith, Safety in Numbers: The mysterious world of Swiss Banking, 1982, পৃ. ৩৩৯।

১৯৮০ সালে ফরাসী কাস্টমস অফিস থেকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকের গোপন তথ্য পাওয়ার চেষ্টায় দুজন ফরাসী অফিসার সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে ধরা পড়েন। তাঁরা চেষ্টায় ছিলেন কোনো এক ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে গোপন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে কাজ হাঁসিল করতে। কিন্তু উল্টোচালে ফরাসী গোয়েন্দারাই সুইস জালে ধরা পড়ে যায়। ঘটনাটি উল্লেখ করার মতো যথেষ্ট রোমাঞ্চকর।[২]

হারমান স্ট্রোয়েলিন ছিলেন সুইস ইউনিয়ন ব্যাংকের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। তাঁর এক্তিয়ারেই ছিল ফরাসী আমানতকারীদের তথ্য। এই তরুণ অফিসারটি এক ফরাসী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তরুণ দম্পতি ফ্রান্সের বার্গান্ডি অঞ্চলে পুরণো বাড়ি কিনে বিশ্রাম আবাস গড়ে তোলেন। একদিন দেখা গেল তাঁর নতুন গৃহ এলাকার সংলগ্ন মাঠে বেশ কিছু পুরনো গাড়ি এসে জমা হয়েছে। গাড়িগুলি নাকি চুরি করা সম্পত্তি এবং স্ট্রোয়েলিন হলেন সেই তস্কর। এমন অভিযোগ তুলে সুইস তরুণটিকে আটক করা হোল।

সমস্ত ঘটনাটাই সাজানো ব্যাপার বলে ফরাসী পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরে স্বীকার করতে বাধ্য হন, কিন্তু সেদিন স্ট্রোয়েলিন রক্ষা পেলেন না। তাঁকে বলা হল চৌর্যবৃত্তির ঘটনা গোপন রাখা হবে যদি স্ট্রোয়েলিন তাঁর ব্যাংকে ফরাসী আমানতকারীদের নাম ধাম ফরাসী শুল্ক বিভাগের হাতে তুলে দেন। সেদিন স্ট্রোয়েলিন চাপে পড়েও কোনোমতেই বেআইনি প্রস্তাবে রাজী হতে চাননি। অভিযোগ মাথায় নিয়ে তিনি মামলা লড়বেন বলে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল বাড়িটি এক স্প্যানিশের কাছে বিক্রি করে তিনি ফরাসী পুলিশ দপ্তরে এসে হাজির। জানালেন, তিনি মত পাল্টেছেন। ফরাসী গোয়েন্দাদের সাহায্য করবেন, গোপন তথ্য সরবরাহ করবেন।

আসলে স্ট্রোয়েলিন ফরাসী গোয়েন্দাদের জব্দ করার সিদ্ধান্ত

২. তদেব, পৃ. ৩৩৯-৩৪৩।

নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুই ফরাসী গোয়েন্দাকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন মসিয়ে র‍্যাল্ফ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি ব্যাঙ্কের গোপন তথ্য ফরাসী গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেবেন। আসলে র‍্যাল্ফ ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান সিকিউরিটি অফিসার—এটি তাঁর ছদ্মনাম।

এপ্রিল মাসের দশ তারিখে এক গোপন সাক্ষাৎকারে ঠিক হলো পাঁচদিন বাদে বাসেল শহরে রেল স্টেশনের কাছে এক রেস্তোঁরায় আবার সাক্ষাৎকার হবে। নির্দিষ্ট দিনে দুই ফরাসী গোয়েন্দা নির্ধারিত রেস্তোঁরায় হাজির হয়ে চেয়ার দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই একদল সুইস পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। শেষ পর্যন্ত দুই গোয়েন্দাকে সুইস আদালতে অপরাধ স্বীকার করে নিতে হয় এবং দুজনের জরিমানা সহ একজনের এক বছর অন্যজনের তিনমাস জেলবাসের শাস্তি ঘটে। সত্তর দশকে সুইস ব্যাঙ্ক থেকে তথ্য চুরির বদলা এইভাবে নেওয়া হল।

* * *

সুইস ব্যাঙ্কের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে সব বড় বড় দেশের একই সমস্যা। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সুইস রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডলারের চোরাচালান প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। যে চুক্তির ফলে মার্কিন সরকার প্রয়োজন হলে সুইস ব্যাঙ্কে গোপন মার্কিন সম্পদ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে পারবে। সম্প্রতি গোপনে ইরাণে অস্ত্র সরবরাহ করে লাভের কড়ি সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ার পর সেখান থেকে ডলার সম্পদ গোপনে নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবীদের কাছে পাঠানোর ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মার্কিন পক্ষ এখন সুইস ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তিমতো অনুসন্ধান কার্য শুরু করেছে বলে সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে। মার্কিন জনমতের চাপে—সেনেট ও কংগ্রেসের তুমুল প্রতিবাদে এই প্রথম মার্কিন কর্তৃপক্ষ সুইস ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত চুক্তিটি কাজে লাগালো।

সুইস ব্যাঙ্ক সম্পর্কে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের শিরঃপীড়া থাকলেও প্রতিবিধানে বেশি দূর এগোবার সুযোগ নেই। প্রথম বাধা সুইস দেশের আইন, ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত কানুন। অপর দেশ থেকে আগত বে-আইনী টাকা সুইস দেশের আইনে বে-আইনি বলে গণ্য হয় না। কর ফাঁকি ও টাকার চোরাচালান সম্পর্কিত দেশ বিদেশের সাধারণ বিধিগুলি সুইজারল্যান্ডের বিধানে মোটেই আপত্তিকর নয়—শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। এটি হলো পয়লা নম্বরের অসুবিধে।

দ্বিতীয়তঃ, দেশ বিদেশের সবচেয়ে সম্পন্ন, পদস্থ, ও সমাজের সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গোপন সম্পদ সুইজারল্যান্ডে এসে জমা হয়। এমন একটি পরিস্থিতি যে কোনো রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষকেই বেশিদূর এগিয়ে যাবার সুযোগ দেয় না।

এই সম্পর্কে মিশরীয় রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। অত্যন্ত টাকার টানাটানিতে একবার ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট নাসের মনস্থ করলেন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ণেতে লোক পাঠিয়ে জেনে নেবেন ইজিপ্টের নাগরিকদের কী গোপন সম্পদ সুইস ব্যাঙ্কগুলিতে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নাসের সুইস সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন। যেহেতু দেশের কর ফাঁকি দিয়ে বেআইনিভাবে সীমানা পেরিয়ে টাকা চলে গেছে বিদেশে, ওই টাকা মূলতঃ রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ইজিপ্টের ওই দারুণ দুর্দিনে গোপন সম্পত্তি দেশের হাতছাড়া করতে তিনি রাজী নন। ইজিপ্সীয় সরকারী প্রতিনিধিরা হাজির হলেন বার্ণেতে।

সমাগত প্রতিনিধিদের সুইস সরকার জানালেন, এ দেশের ব্যাঙ্কগুলির ওপর সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই—এরা নিজস্ব স্বাধীন নিয়মে চলে। এ ব্যাপারে সরকার অসহায়। তবে সুইস সরকার প্রয়োজনীয় পরামর্শটি দিলেন। বলা হলো, সুইস ব্যাঙ্ক ব্যবসার কেন্দ্রস্থল জুরিখে গিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রতিনিধিরা কথা বলে দেখতে পারেন।

জুরিখের কর্তৃপক্ষ বিদেশী প্রতিনিধিদের যথেষ্ট খাতির করলেন। সরাসরি আপত্তি প্রকাশ করে বিমুখ করলেন না। হাজার হোক প্রেসিডেন্ট নাসের বিশ্বের অন্যতম সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর প্রেরিত প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করা যায় না। ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জানালেন সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি কিছু পরামর্শ করে নিয়ে সিদ্ধান্তটি জানাবেন। কয়েকদিন বাদে ইজিপ্টের প্রতিনিধিরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করলেন।

অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট জানালেন, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। সেই সুবাদেই তাঁরা একটি অনুকূল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো, যে সব ইজিপ্সীয়দের টাকা সুইস ব্যাংকে রয়েছে তাদের নাম ধাম সঞ্চিত টাকার পরিমাণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সব কিছুই প্রকাশ করে দেবেন। তবে একটি-মাত্র শর্ত—এই তালিকাটি কায়রোর সংবাদপত্রে পুরোপুরি ছাপিয়ে দিতে হবে। এইটুকু আশ্বাস পেলেই তাঁরা গোপন তালিকা হাতে হাতে দিয়ে দেবেন। তবে কথা দিয়েও যদি না ছাপানো হয় তাহলে সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ য়ুরোপের বড় বড় কাগজগুলিতে ওই তালিকা ছাপিয়ে দেবেন।

শর্তটি শোনার প্রতিক্রিয়া হল তাৎক্ষণিক। প্রতিনিধিরা একবাক্যে জানালেন, 'থাকগে, আমাদের ওসব জানবার আর দরকার নেই। আমরা অনুরোধ ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

ইজিপ্সীয় প্রতিনিধিরা শুধু হাতেই স্বদেশে ফিরে এলেন।

আসলে বিশ্বের অন্য সব দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সুইস ব্যাংক সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু করার নেই। বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর নাৎসী নেতাদের কোটি কোটি টাকার গোপন সম্পদ সুইস ব্যাংকে সঞ্চিত ছিল। একমাত্র এই কারণেই জঙ্গী নাৎসী সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া বাদে ইউরোপভূমি দখল করলেও সুইজারল্যান্ডের মাটিকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে এড়িয়ে

গেছে, যদিও এক সময়ে টাকার টানাটানিতে হিটলারের সঙ্গে সুইস কর্তৃপক্ষের বেশ খানিকটা মনোমালিন্য ঘটেছিল জার্মানীর গোপন সম্পদ নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিটলারের মতো জঙ্গী ও যুদ্ধবাজ নেতাকেও আত্মসম্বরণ করতে হয়, হাত গুটিয়ে রাখতে হয়।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁর গোপন সঞ্চয়ের কথা বিশ্ব জানতো না। মার্কোস ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেই সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফিলিপাইন সরকারের সামান্যতম অনুরোধ মাত্রেই গোপনতা ফাঁস করে দেয়। এখানে ব্যাংকের বিশেষ আইনকানুন বাধার সৃষ্টি করেনি। মার্কোসের গোপন টাকা যখন সুইস ব্যাংকে সঞ্চিত হতে থাকে তখন এটি সুইস দেশের কাছে বেআইনি সম্পদ বলে গণ্য হয়নি। বিনা দ্বিধায় ওই সম্পদের গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে কিন্তু পদচ্যুতি ঘটার পর গোপনীয়তা ফাঁস করায় বাধা আসেনি—আসল বাধাটি ছিল ফিলিপাইন রাষ্ট্রে, যতদিন মার্কোস জীবিত ছিলেন। একই বাধা হিটলারও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন—সেই সুবাদে সুইজারল্যান্ড বিশ্বে একমাত্র শান্তিকামী দেশ বলে পরিগণিত হতে পেরেছে। ভারতের গোপন সম্পদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতি হল প্রধান অন্তরায়। সুইস ব্যাংকের বিধি বিধানের ওপর দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয় মোটেই।

এই সূত্রে মনে পড়ে যায় বিজ্ঞানভিত্তিক কল্প কাহিনীর বিখ্যাত লেখক আর্থার ক্লার্কের একটি কল্প কাহিনীর বিচিত্র কথা। কাহিনীটির নাম, 'হোয়েন দ্য টোয়ার্মস্ কেম'। এই কাহিনীর সারমর্ম হোল: বিশ্বের বাইরে অতি দূর কোনো এক গ্রহ থেকে আক্রমণকারীরা এসে হাজির হয়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। দূর গ্রহে বসে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা বিশ্বের যাবতীয় তথ্য আত্মস্থ করে নেয়। আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবী তারা জয় করে নিতে চায়। আণবিক বা পারমাণবিক কায়দায় বা লেসার

রশ্মির সাহায্যে কোনো মহামারী বাধাবার সংকল্প তাদের ছিল না। পৃথিবীর রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষগুলির দুর্বলতম বিষয়গুলি তাদের জানা ছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রযুক্তি ছিল তাদের আয়ত্তাধীন।

পৃথিবীর মাটিতে নেমে তারা সরাসরি সুইজারল্যান্ডে চলে আসে। অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাহায্যে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে তারা জুরিখ, রাসেল ও বার্নে-র যাবতীয় ব্যাঙ্কের কোড নম্বর সহ গোপন নামধামসহ টাকার হিসাব অসংখ্য ফোটো-গ্রাফিক ফিতায় তুলে নেয়। এই কাজটি সারা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারে এই ভেবে যে এতক্ষণে সারা বিশ্ব তাদের হাতের মুঠোয়।

কমিশন না প্রহসন

ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দুটি চিঠি। ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থার সঙ্গে, সাংবাদিক ও হিসাবরক্ষক গুরুমূর্তিকে জড়িয়ে ওই চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল। চিঠি দুটির বক্তব্য থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে রিলায়েন্স কোম্পানি সম্পর্কিত অসমর্থিত অভিযোগে তদন্ত করার কাজে ফেয়ারফ্যাক্সকে জড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে বোম্বে ডাইং কোম্পানীর কর্তা নুসলি ওয়াদিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে। এটি আসলে রিলায়েন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে বোম্বে ডাইং-এর যে অভিযোগ তার সঙ্গে ভারত সরকারকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা। যেন একই অভিযোগ ভারত সরকারেরও। আসলে এ-কাজে ভারতের স্বার্থ যেমন নেই উল্টে বিদেশী গোয়েন্দা নিয়োগ ক'রে ভারতের রাজনৈতিক স্থিতি-শীলতা নষ্ট করার অপচেষ্টা রয়েছে। ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের রায় এমন ধারণার জন্ম দিয়েছে।

কমিশনের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহকে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়, তাতে একটি প্রশ্নে ফেয়ারফ্যাক্সের কর্তা মাইকেল হার্শমানের সঙ্গে বোম্বে ডাইং-এর যোগাযোগ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে। শ্রী সিং উত্তরে জানিয়েছিলেন, ব্যাপারটি তিনি প্রথম জানলেন সংবাদপত্রে চিঠি প্রকাশিত হবার পর। তবে এ-কথাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, চিঠি প্রকাশিত হবার পর যে বিতর্ক উঠেছে জাল চিঠি কিনা সে সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তখনই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চিঠির সত্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদি চিঠিগুলি জাল না হয় তা হলে গুরুমূর্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে, নচেৎ জাল চিঠির রচয়িতা এবং তার প্রকাশ সংক্রান্ত কাজে অপরাধীকে খুঁজে শাস্তি দিতে হবে—কারণ এই ঘটনার সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি জড়িত।

আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল, ঠক্কর কমিশনে দুটি চিঠি উল্লিখিত হয়েছে

কিন্তু সত্যতা সম্পর্কে যে অভিযোগ রয়েছে তা যাচাই করা হয়নি। উল্টে কমিশনের রায়ে অনুমান করা হয়েছে ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাকে ভারতের রাজস্ব দপ্তর টাকা না জোগালেও বোম্বে ডাইং নামের সংস্থা প্যারিশ্রমিক বাবদ হয়তো কিছু দিয়েছে।

হয়তো!

আরো বিস্ময়কর হলো এই অনুমানটি করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন ঘোষণাও করেছে শ্রী ওয়াদিয়ার তরফ থেকে ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাকে টাকা দেওয়া সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসযোগ্য নজীর বা প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কমিশনের হাতে প্রমাণ নেই অথচ অনুমানের ভিত্তিতে অভিযোগ তোলা কমিশন অসঙ্গত বলে মনে করেনি।

কমিশনের এই রিপোর্ট কতটা নিরপেক্ষ এই বক্তব্যে তা যাচাই হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, কমিশনের প্রতিবেদনে একটা অধ্যায়ে কেবল এস গুরুমূর্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। কারণ, গুরুমূর্তি রিলায়েন্স কোম্পানি সম্পর্কে একটি বছরে (মার্চ ১৯৮৬—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭) ২৫টি নিবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে শ্রী আর পি গোয়েঙ্কার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নামের সংবাদ-পত্রে। অভিযোগ হলো, নিবন্ধগুলিতে গোপন সরকারি তথ্যের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে—যে সব তথ্য রাজস্ব বিভাগের গোয়েন্দা শাখার হেফাজতে ছিল এবং এই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই রিলায়েন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য ফেয়ারফ্যাক্সকে নিয়োগ করা হয়।

কমিশন গুরুমূর্তিকে অনেকগুলি প্রশ্ন পাঠায় উত্তর দেওয়ার জন্য। গুরুমূর্তি প্রশ্নগুলির কোনো জবাব দেননি—উল্টে কিছু আইনগত প্রশ্ন রেখেছেগ কমিশনের কাছে, এবং কমিশনের কী কী করা উচিত তাও বক্তব্যে রেখেছেন শর্ত দিয়ে যে এগুলি পালন করা হলে তিনি প্রশ্নগুলির জবাব দেবেন। ফলে, ব্যাপারটা দাঁড়ালো, এই কমিশন তাদের প্রতিবেদনে একটা অধ্যায় জুড়ে গুরুমূর্তিকে টেনে এনেছেন বিরূপ মন্তব্য সহকারে।

এই রিপোর্টে মূল অভিযোগ হলো, ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাকে নিয়োগ করার ব্যাপারে কোনো সরকারী সিদ্ধান্তের কথা সময়মতো সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মৌখিক আদেশে তদন্ত শুরু করার ব্যবস্থা হয়েছে, এইসব গর্হিত কাজ হয়েছে বিশ্বনাথ প্রতাপের আমলে। এইসব সমালোচনা প্রকাশ করতে গিয়ে কমিশন বিবেচনা করে দেখেনি যে, অর্থনৈতিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রথমাবস্থায় মৌখিক পর্যায়ে রাখা হয় যাতে তদন্তের খবর গোপন সূত্র থেকে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

কমিশনের দ্বিতীয় গুরুতর অভিযোগ হলো, বিদেশে তদন্তের কাজে বিদেশী সংস্থার সাহায্য নেওয়া দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এমন কি বিদেশে বেআইনিভাবে ভারতের টাকা চালান করার চেষ্টার থেকেও এটি গুরুতর অপরাধ, এমন ধারণা কমিশনের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এই রায়ের ফলে এক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অপরাধীর মস্তো আশঙ্কা দূর হবার সুযোগ ঘটেছে। বিদেশ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অপরাধকে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি—এবার থেকে আর কোনো বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেওয়া হবে না—একটি নিরাপত্তার আশ্বাস তারা পেয়ে গেল। অনেকেই বিস্মিত কমিশনের এমন এক আশ্চর্যজনক পদক্ষেপে।

অথচ ভারত সরকার বিভিন্ন তদন্তের কাজে এর আগে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিয়েছে। খুবই সম্প্রতিকালের একটি নিদর্শন রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারল বৈদ্য নিহত হওয়ার পর তদন্ত কাজে সাহায্যের জন্য মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সংস্থাটিকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এমন কি বোফর্সের ব্যাপার নিয়েও দিল্লীর সরকার সুইডিশ সরকারকে তদন্ত করতে অনুরোধ জানায় যদিও সুইডিশ সরকার এই অনুরোধে সাধ্যমত কর্ণপাত করেনি। যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা সুইডেনের সরকারি কৌঁসুলি লারস্ রিংবার্গের তরফ থেকে হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিংবার্গের অভিযোগ শোনা গেল, ভারত

সরকারের অসহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্ভব হলো না—অথচ ভারত সরকার এই তদন্ত বন্ধ করে দিতেও অনুরোধ জানায়নি। এমন কি বোফর্স সংক্রান্ত ভারতের সংসদীয় কমিটিও রিংবার্গকে যথাসময়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি।

ফেয়ারফ্যাক্স ছাড়াও রাজস্ব দপ্তর একই সঙ্গে বিভিন্ন তদন্তের কাজে একাধিক বিদেশী সংস্থা ও ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছে এবং কয়েক লক্ষ টাকা এই বাবদ খরচও হয়েছে। সে তথ্য ও সংবাদ একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে[১], ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের সেসব নজরে পড়েনি বা এড়িয়ে গেছেন।

গত ১৪ ডিসেম্বর (১৯৮৭) রাজ্যসভায় কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের কালে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ওই অভিযোগটি করেছিলেন যে, এই রিপোর্ট অর্থনৈতিক অপরাধীদের স্বাধীনতার সনদ। বিশ্বনাথপ্রতাপের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে কিন্তু প্রস্তাব রেখেছিলেন। ওই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে বিদেশে টাকা পাচারকারীদের সম্পর্কে কিছু না কিছু তথ্য পাওয়া যেত। এগুলি কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল কমিশন এই ব্যাপার নিয়ে কর্মরত সরকারী দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তে নেমেও গোপনে বৈদেশিক অর্থ তছরূপকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আশংকা প্রকাশ করেনি। রিপোর্টটি গোচরে আনলে অসুবিধে হবে না যে বৈদেশিক মুদ্রা কারচুপির ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার সযত্ন প্রয়াস রয়েছে।

বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং হাটে হাঁড়িটি ভেঙেছেন। তিনি রাজ্য-সভায় জানান যে, তাঁর অর্থমন্ত্রী হওয়ার আগেও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তখন কিন্তু মনে হয়নি এই নিয়োগ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। এবারে যখন শাসক দলের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির এবং

১. The Week, December 20-26, 1987

তাঁদের অনুগ্রহভাজন মানুষজনের দুষ্কৃতি ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই আওয়াজ তোলা হলো বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার নিযুক্তি ঘটলে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে।

বিশ্বনাথপ্রতাপ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে। তিনি আরো জানিয়েছেন, মৌখিক নির্দেশ দেওয়া নিয়ে কমিশনের কটাক্ষপাত অসঙ্গত। দিল্লির প্রশাসনে মৌখিক নির্দেশ দেওয়ার রেওয়াজ নতুন কিছু নয়। তাঁর মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এসব চলে আসছে। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে বিদেশ সচিব ও দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জোরালো বক্তব্যের সঙ্গে জানিয়েছেন, ফেয়ার-ফ্যাক্স সংস্থার নিয়োগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি আগেই অবহিত করেছিলেন। এই কারণেই তাঁর দাবি ছিল কমিশনে উপস্থিত থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগটি পাওয়া। কমিশন আইন অনুযায়ী তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। **কিন্তু ব্যাপারটি জটিল হয়ে পড়তো যদি তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ পেতেন।**

সাক্ষ্য দিতে এসে বিশ্বনাথপ্রতাপ প্রধানমন্ত্রীকে কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজির করার দাবি জানাতেন, তিনি কতটা জানেন কি না জানেন সেই প্রশ্ন উঠতো। প্রধানমন্ত্রীর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকতো না।

বিশ্বনাথজী বলেন এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই তাঁকে, ভুরেলালকে ও বিনোদ পান্ডেকে সাক্ষ্যদানের সুযোগটি দেওয়া হয়নি। অথচ কমিশনের রায়ে এঁদেরই ওপর অভিযোগ করা হয়েছে এঁদের বক্তব্য না শুনেই।

তবে দুই বিচারকের সর্বসম্মত রায় এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস (আই) দলের প্রত্যাশার হুবহু মিল গুরুতর রকম সন্দেহের উদ্রেক

করে। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রেই এই ধরনের মন্তব্য শোনা গেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চাহিদা এবং দুই বিচারকের সিদ্ধান্তের মধ্যে এই মিল কি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার—প্রায় সব সংবাদপত্রেই এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

কমিশনটির আয়ুষ্কালের মধ্যে বা জন্মের আগে ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগ সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন ও বিষয় শাসক দলের বিরোধী পক্ষের আলোচ্য ও সমালোচনার বিষয় ছিল সেগুলি বিন্দুমাত্র আলোচিত হয়নি কমিশনের রিপোর্টে, অথচ সরকার ও শাসক দল যেভাবে বিশ্বনাথপ্রতাপকে সংসদে ও সংবাদপত্রে বিবৃতির মারফৎ আক্রমণ করেছে বা গোপন তথ্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে অনুরূপ পদ্ধতি ও উপাদানের সমাবেশ বিস্ময়করভাবে দুই বিচারকের রায়ে উপস্থিত। এটি শাসকদলের সভায় অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে।

রায়টি প্রকাশিত হবার পর কংগ্রেস (আই) দলের সংসদীয় কমিটির সভা বসে। এই সভার অত্যাশ্চর্য বিবরণ সংবাদপত্রে বেরোয়। ভারত সরকারের একদা রাষ্ট্রমন্ত্রী এন কে পি সালভে ওই সভায় তাঁর উচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেন নি। খবরে প্রকাশ, তিনি বলে বসলেন, ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের কাছে কংগ্রেস (আই) দলের সদস্যগণ যে স্মারকলিপি পেশ করেছেন দুই বিচারকের রায় হুবহু তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[২]

সালভে যখন দুই বক্তব্যের মধ্যে অনুরূপ উপাদানগুলি ব্যাখ্যা-সহ বলতে শুরু করেন তখন দলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী আজাদ প্রায় ধমক দিয়ে সালভের বক্তব্য থামিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলতে শুরু করেন, দল যা বলতে চেয়েছে সেইমতো রায় বেরিয়েছে এতে দলের সদস্যরা খুশি হতে পারেন কিন্তু প্রসঙ্গ এমনভাবে উত্থাপিত হলে দলের বাইরের প্রতিক্রিয়া শুভ হবে না। দলের সাধারণ সচিব বিপদ সংকেতটি যথাযথভাবেই ধরতে

২. Indian Express, December 12, 1987.

পেরেছিলেন। দলের বক্তব্য এমনভাবে তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হলে কমিশনের নিরপেক্ষতার অভিনয় চুরমার হয়ে যায়।

*   *   *

কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল ছ'টি।[3]

১. ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাটিকে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা?

২ নিয়োগ করা হয়ে থাকলে

(ক) কোন পরিস্থিতিতে নিয়োগ করা হয়?

(খ) এই নিয়োগের প্রকৃতি কি ছিল?

(গ) কোন্ কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগের জন্য দায়ী?

(ঘ) কী উদ্দেশ্যে এই নিয়োগ?

(ঙ) নিয়োগের শর্ত কি ছিল?

(চ) যে কাজের জন্য নিয়োগ ফেয়ারফ্যাক্স তার যোগ্য কিনা?

৩. (ক) ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাটিকে এই কাজের দরুণ টাকা দেওয়ার অনুমোদন বৈধ ছিল কিনা?

(খ) কত টাকা দেওয়া হয়েছে সংস্থাটিকে?

(গ) দেওয়া হলে কেন দেওয়া হয়েছে?

৪. ভারত সরকারকে এই সংস্থা কোনো তথ্য সরবরাহ করেছে কিনা?

৫. তথ্য দেওয়া হলে সেগুলি কী তথ্য?

৬. এই ব্যবস্থায় ভারতের নিরাপত্তার ওপর কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা?

আশ্চর্য ঘটনা হল, যে দুটি চিঠি নিয়ে ফেয়ারফ্যাক্স সংক্রান্ত বিতর্ক শুরু হয়েছিল, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় অন্যতম সংবাদ বিশ্লেষক ও পত্রিকার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গুরুমূর্তিকে লেখা ফেয়ারফ্যাক্সের জাল চিঠি, সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছে কমিশন।

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

অজুহাত হল, চিঠি প্রসঙ্গ কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে নেই। কিন্তু কমিশন এমন কিছু বিষয়ের ওপর মন্তব্য করেছেন যেগুলি বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

যেমন, (১) যথাযথ তদন্তের কাজে ভারতীয় তদন্ত কমিশন আইন কতটা কার্যকর সে সম্পর্কে কমিশনের মতামত দেওয়া।

(২) কমিশনের বিচারপতিদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা।

(৩) সংবাদপত্রের আক্রমণ থেকে বিচারপতিদের বাঁচাতে আদালতের ব্যর্থতা।

এগুলি কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তবু কমিশনে এ সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে কারণে বিতর্ক ওঠায় তদন্ত কমিশন বসানো হয় তার পশ্চাদ্‌পট, অর্থ-নৈতিক অপরাধীদের সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, কীভাবে দেশে ও দেশের বাইরে সার্থক তদন্তের ব্যবস্থা হ'তে পারে সে সম্পর্কে কমিশনের নীরবতা বিস্ময়কর ঠেকে।

আরেকটি মন্তব্য কমিশনকে দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে পুরোপুরি ঠেলে দিয়েছে সেটি হলো, "সরকারের স্থিতি বিনষ্ট হলে দেশের স্থিতি বিনষ্ট হয় না—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা অহেতুক বাক্‌জাল বিস্তার করেন।" এটি কমিশনের বক্তব্য। **সরকার ও দেশকে কমিশন সমার্থক বলে দেখিয়েছেন। এই একটি মন্তব্য কমিশনের রাজনৈতিক চরিত্র উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। কমিশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে জবরদস্ত সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।**

তদন্ত কমিশন কর্তৃক এই ধরনের মন্তব্য তদন্ত কমিশন মারফৎ সরকারের উদ্দেশ্যটি খোলাখুলি বলে দেয়।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ২৯৩ পাতার এই গুরুগম্ভীর রিপোর্টটি এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে যা দেশের সুনীতি, সুবিচার ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক।

*   *   *

*   *   *

বিশ্বনাথ প্রতাপের অর্থমন্ত্রীত্বের কালে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছিল। কিছু বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অপরাধের তদন্তে সহযোগিতার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা ও ব্যক্তির গোপন কারচুপির সন্ধান রাজস্ব দপ্তরের গোচরে আসায় ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাকে তদন্তের জন্য নিয়োগ করা হয়।

এই কাজে কোনো বিদেশী সংস্থার নিয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা সে নিয়ে নিশ্চয় বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু মূল প্রশ্নটি সরকার যেমন এড়িয়ে গেছেন, ঠক্কর-নটরাজন কমিশনও এড়িয়ে গেছেন। মূল প্রশ্ন, দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ ক'রে কালো টাকার পাচার সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা।

তদন্ত কমিশনকে বলা হ'ল না, টাকা পাচারের তদন্ত করো। বলা হ'ল খুঁজে বার করো, তদন্ত করার আদেশ কে দিল—সে আদেশ আইনসম্মত কিনা। আর তদন্ত ফেয়ারফ্যাক্স সংস্থাকে দিয়ে করানো হলে দেশের কোনো বিপদ ঘটবে কিনা, তা বিচার করো। অর্থাৎ, চোর ধরতে হবে না, চোর ধরতে যে বলেছে তাকে খুঁজে বার করো।

মজার ব্যাপার হলো, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে গুরু-মূর্তির নিবন্ধগুলি সম্পর্কে কমিশনের আপত্তি। তিনি নাকি গোপন সরকারি নথিপত্র থেকে তথ্য চুরি ক'রে রিলায়েন্স কোম্পানির কর ফাঁকি ও বিদেশী মুদ্রা চুরির তথ্য প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

রিলায়েন্স কোম্পানির অপরাধ সম্পর্কে কমিশন নীরব। মাথা-ব্যথা হলো—ওই একচেটিয়া কোম্পানি কর্তৃক টাকা চুরির গোপন কথা ফাঁস করা হল কেন? কমিশনের রায় পড়ে মনে হবে গোপন খবরের জন্য বিদেশী সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে—তা যদি না হয় তবে চুপ করেই থাকতে হবে।

সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গোপন টাকা রয়েছে। সুইস সরকার তা জানাবে না, কার কী টাকা রয়েছে। ভারত সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও বোফর্স কোম্পানির ভারতীয় এজেন্ট যিনি মার্কিন দেশে পলাতক, তাকে ভারতে ফেরৎ পাঠাতে মার্কিন সরকার নারাজ। বিদেশী সরকারের সঙ্গে আপোষ ক'রে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব চেপে যেতে হবে—কমিশনের রায় থেকে এই সিদ্ধান্তই এসে যায়।

*　　　*　　　*

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর বিরুদ্ধে কমিশনের মূল অভিযোগ ছ'টি ঃ

১. প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পরিষদকে তিনি যথাসময়ে ফেয়ারফ্যাক্সের নিয়োগের ব্যাপারটি যথাসময়ে জানান নি।
২. এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি দপ্তরের কাগজপত্রে নথিভুক্ত করা হয়নি।
৩. মূল্যবান সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার দায়িত্ব আমলাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৪. সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ শুরু করে দেওয়ার পর ফাইলে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
৫. আমলাদের মারফৎ এমন এক বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে যারা পূর্বে মার্কিন সি, আই, এ সংস্থার কর্মচারি ছিলেন।

কমিশনের মতে এইসব কাজগুলি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী।

ব্যাপারটি নিয়ে যে অযথা বিতর্ক তোলা এবং দোষারোপ করা হয়েছে বিশ্বনাথ প্রতাপ সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলেছেন, সব ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্বাহ্নেই তিনি কথা বলে নিয়েছিলেন, এমন কি যখন বিতর্ক শুরু হয় তখনও তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন এবং পদত্যাগ করবার জন্য প্রস্তাব দেন। দপ্তরের কাজকর্মে খোঁজখবর

নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তখন সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[৪] এই সূত্রেই বিশ্বনাথপ্রতাপ দাবি জানিয়েছিলেন, এমন কি যখন বিতর্ক শুরু হয় তখনও তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন এবং পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেন।[৫]

প্রধানমন্ত্রী ওই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। দপ্তরের কাজকর্মের খোঁজখবর জেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এই সূত্রেই বিশ্বনাথ প্রতাপ দাবি জানিয়েছেন কমিশনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে দেশ ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজের জন্য আদালতে অভিযোগ বা মামলা আনা হোক, কারণ তখনই প্রধানমন্ত্রীকে মামলায় অন্যতম সাক্ষী হিসেবে স্থাপন করে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রকৃত সুবিচারের জন্য প্রকাশ হওয়া দরকার।

এ ছাড়াও কমিশন রাজস্ব সচিব বিনোদ পান্ডের লিখিত জবানী পেয়েও বিবেচনা করেননি বলে অভিযোগ। তাঁদের রায় প্রস্তুত করার সময়ে প্রচলিত সরকারী রীতিনীতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয়নি, যা শ্রীপান্ডের বিবৃতির মধ্যে ছিল। ব্যাপারটিকে শ্রীপান্ডে ও ভুরেলালের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধহীনতার পর্যায়ে নিয়ে এসে অভিযোগ করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক তদন্তের ব্যাপারগুলি যে গোপনে সারা হয়—তদন্ত শুরু করার সময়ে, এমন তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় কোন কিছুই লিখিতভাবে রাখা হয় না। কী তদন্ত চলছে, কে তদন্ত করছে, কাদের বিরুদ্ধে কী সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যার দরুণ ওই তদন্তের ব্যবস্থা, বা কবে কখন তদন্ত শুরু হল, তদন্তে কারা নিযুক্ত এসব তথ্য সরকারি নথিতে তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় নথিভুক্ত করার রেওয়াজ নেই।

ফেয়ারফ্যাক্স কর্তৃক তদন্ত চলাকালীন অবস্থায় তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা হয়নি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটি টেঁকে না। কারণ এর আগে এই জাতীয় কাজে প্রচলিত সরকারী রীতি

---

৪. India Today, December 31, 1988.

৫. তদেব।

যা অনুসরণ করা হয়েছে, সেই রীতি পদ্ধতি ফেয়ারফ্যাক্সের ক্ষেত্রেও মানা হয়েছে। এই ছিল বিনোদ পান্ডের বক্তব্য।

এইসব রীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও রাজস্ব সচিব হিসেবে বিনোদ পান্ডেকে গাফিলতির জন্য দোষারোপ করা হয়েছে। বিনোদ পান্ডে আরো জানিয়েছেন দেশের বাইরে থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় গোয়েন্দা দপ্তরে খরচের জন্য এক কোটি টাকার বাজেট নির্দিষ্ট থাকে। এই টাকা খরচের প্রধান সহায় বিদেশী সংবাদ সংগ্রাহকেরা। দপ্তরের কাজে এটি নতুন কোনো কর্ম নয়।[৬]

অনুরূপভাবে ভুরেলালকেও দোষী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান হিসেবে ইনি সব কাজই গোপনে সারেন, কোনো লেখাপড়ায় যান না। কমিশন অনেকখানি জায়গা নিয়ে সমালোচনা করেছেন ভুরেলালকে এই কারণ দেখিয়ে যে, ইনি তাঁর গোপন সূত্রগুলির যোগাযোগ করেন, পার্কে, রেষ্টুরেন্টে, গোপন সব স্থানে, অফিসে নয়—এই হলো গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানের বিরুদ্ধে বিচারকদের সমালোচনা! বিচারকেরা পড়েও দেখেননি বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনে ৭৮ ধারায় বলা রয়েছে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা কখনোই গোপন সূত্রের সন্ধান প্রকাশ করবে না।

কমিশনের আর একটি সমালোচনা হল, বিদেশে যখন গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে তখন বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তা নেওয়া হয় না কেন? যদিও ভুরেলাল জানিয়েছেন, নামজাদা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কির্লোস্কার ও থাপার পরিবারের ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো গোপন তদন্তে এর আগে মার্কিন দূতাবাসের সহায়তা নিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে দেখা গেছে সংস্থাগুলি গোপন তদন্তের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যায়। তদন্তের গোপনতা রক্ষিত হয় না। ফলে গোপন সূত্র বা সাক্ষ্যগুলি অদৃশ্য হয়ে

৬. India Today, December 31, 1987.

যায়। সেই কারণেই বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলির ওপর নির্ভরতা স্থাপন করা যায় নি। ভুরেলালের এই বক্তব্য ঠক্কর-নটরাজন কমিশন কোনোরকম গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি।

কমিশনের রায় শেষ পর্যন্ত জনমতের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। কারণ কমিশনের রায়ে যাদের ওপর লক্ষ্য করে হাতিয়ার শানানো হয়েছে তাদের কাউকেও তদন্ত কমিশন আইন অনুযায়ী সাক্ষ্যদানে ডাকা হয়নি। অবস্থার চাপে বিচার বিভাগের প্রতি-নিধিরাও যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলো না এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে কমিশনের রায়ের বিরূপ সমালোচনা হয়েছে।

কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সমালোচনা হল যেসব অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্তের জন্য বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল তার সবটাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে, এমন কি কী ভাবে, কোন পথে বিদেশের মাটিতে সংঘটিত ভারতীয়দের দ্বারা অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক অপরাধের তদন্ত হতে পারে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোচনা ঠক্কর-নটরাজন কমিশন করেনি।

সারা বিশ্বজুড়ে ধনতান্ত্রিক জগতে অর্থনৈতিক অপরাধের প্রবণতা সম্প্রতিকালে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে! এই পরিস্থিতি পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুনিয়া জোড়া সংকটের প্রতিফলন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সহজ ও সোজা পথে বাঁচার উপায় ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে চলেছে যার ফলে অর্থনৈতিক অপরাধের বিস্তার লাভ অতি সহজে ঘটে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের কর্নধারেরাও এইসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন অজস্র ঘটনা ঘটেছে, কোনো দেশে রাষ্ট্রনায়কেরা অভিযুক্ত হয়েছেন সামাজিক ন্যায়বিচারের চাপে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিচারের নামে প্রহসন সমাজে ও রাষ্ট্রে স্থান পেয়ে গেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শ্রেণী প্রাধান্যের কারণে।

ভারতের ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের রায় সম্পর্কে এমন অভিযোগ

প্রবল। ঠিক অনুরূপ ঘটনা অভিনীত হতে চলেছে বোফর্স সংক্রান্ত সংসদীয় তদন্ত কমিটির কাজে কর্মে। এই কমিটির প্রধান, সংসদের প্রধান সদস্য বি শংকরানন্দ। বোফর্স কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৮৭) শংকরানন্দ কমিটির সামনে হাজির হয়েছিল বটে কিন্তু কিছুই প্রকাশ করেনি সেদিন।

সেদিন বোফর্স-কর্তাদের আচরণ দেশজুড়ে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। এমন কি, কমিটির কয়েকজন সদস্য শংকরানন্দজীর কাছে তাঁদের অনুযোগটি জানিয়েছিলেন। এখন কমিটির কাজ গুটিয়ে আনার মুখে বোফর্স কর্তাদের আরেকবার সাক্ষ্যদানের চেষ্টা হল, এটি সাধারণভাবে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা। ঘটনার পারম্পর্য তা জানিয়ে দিচ্ছে।

বোফর্স কর্তারা কবে আসছেন (১৯৮৮ সালের এপ্রিলে) কমিটির সদস্যদের তা আগে জানানো হয়নি। আগমন বার্তাটি কেবল আকস্মিক জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রের খবর হলো, এপ্রিল ছ' তারিখে শংকরানন্দজী কমিটির সদস্যদের কাছে কেবল আগমন বার্তাটি জানালেন, দিন ক্ষণ নয়।[৭]

বোফর্স কর্তারা—গর্থালিন ও মোরবার্গ আবার ভারতে আসছেন, তাঁরা সংসদীয় কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবেন, কবে দেবেন তা বলা হল না। সাত তারিখ ভোর হতে না হতেই আরেকটি করে চিঠি কমিটির সদস্যরা পেয়ে গেলেন। শংকরানন্দজী জানালেন, এ্যাটর্নী জেনারেল শ্রীপরাশরণ সদস্যদের কাছে তাঁর বক্তব্য রাখবেন সাত এপ্রিল, অপরাহ্নে।

গত সেপ্টেম্বরে (১৯৮৭) বোফর্স কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে শংকরানন্দজী জানিয়েছিলেন সদস্যরা যেন উত্তপ্ত আচরণ না করেন, এটা তাঁর অনুরোধ। মাননীয় বিদেশী ব্যক্তিদের মনে এমন ধারণা যেন না হয় যে তাঁদের অপরাধী ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁদের মনে কোনো রকম আঘাত দেওয়া উচিত হবে না। এমন পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না করা হয়

৭. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৯ই আগস্ট ১৯৮৮।

যাতে তাঁরা বিরূপ হয়ে সত্য প্রকাশে নাচার হয়ে ওঠে। কোনো অপমানজনক প্রশ্ন যেন না করা হয়—এই সব অনুরোধ পরিষ্কার ভাবে শঙ্করানন্দের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল।[৮]

এই বক্তব্য গত সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির সদস্যদের কাছে হাজির করে শঙ্করানন্দজী বোফর্স কর্তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

এবারেও যথারীতি অনুরূপ পরিস্থিতি। বোফর্স কর্তারা ঠিক কবে আসছেন এটি আগে ভাগে জানানো হল না। এপ্রিলের সাত তারিখে সভাটি বসার পর সরকারি ভাবে জানানো হল এ্যাটর্নী জেনারেল শ্রীপরাশরণ নয়, বোফর্সের দুই কর্তা মোরবার্গ ও গথলিন সাক্ষ্য দিতে আসছেন।[৯]

এ আই ডি এম কে-র রাজ্যসভার সদস্য আলাদি অরুণা শঙ্করানন্দজীকে প্রশ্ন করলেন, আগের দিন জানানো হল বোফর্স কর্তারা আসছেন বটে কিন্তু বক্তব্য রাখবেন শ্রীপরাশরণ। কিন্তু ব্যাপারটি তা হল না। বোফর্স কর্তারা এসে গেল, অথচ আপনি জানলেন না, আমাদের ও জানানো হল না। এখন শুনছি শ্রীপরাশরণের বদলে বোফর্স কর্তারা সাক্ষ্য দেবেন। আমরা তো প্রস্তুত নই—কী কী প্রশ্ন করবো ভেবে আসি নি। আজ পরাশরণের বক্তব্য শোনা যাক। বোফর্স কর্তারা কাল সাক্ষ্য দেবেন, ইতিমধ্যে আমরা তৈরী হয়ে নেব।

শঙ্করানন্দজী জানালেন, না, তা হতে পারে না। আজকেই ওঁরা সাক্ষ্য দেবেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শ্রীশঙ্করানন্দ ব্যাপারটি ভোটে দিলেন। অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেস (আই) দলীয়। দু-একজন দলহীন নিরপেক্ষ আর দু-একজন হয় এ আই ডি এমকে দলীয় নয়তো কাশ্মীরের ন্যাশানাল কনফারেন্স পার্টির সদস্য। যা হবার তা হল, ভোটে কংগ্রেসীরাই জিতলো।

'একদা বোফর্সের প্রধানতম কর্মকর্তা মার্টিন আর্ডবো, যিনি চুক্তির সময়ে ভারতে ছিলেন তিনি এলেন না কেন'—এক সদস্যের

৮. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৯ই আগস্ট, ১৯৮৮।

৯. তদেব।

এই প্রশ্নের জবাবে শঙ্করানন্দজী সদস্যদের জানিয়েছিলেন, আর্ডবো সাহেব এখন কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করে চলে গেছেন, পদত্যাগ করেছেন। তাঁর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার কোম্পানির জানা নেই—সেই কারণেই তাঁকে ভারতে আসার জন্য বলা যায় নি।

এক সদস্য বোফর্স কর্তাদের প্রশ্ন করলেন, মার্টিন আর্ডবো এই সেদিন কোম্পানির সর্বময় কর্তা ছিলেন। এখন তাঁর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার কোম্পানির জানা নেই—এতে বোঝা যায় কোম্পানির কাজকর্ম মোটেই ভাল নয়।

এ আই ডি এম কে দলের এক সদস্য বোফর্স কর্তাদের এই প্রশ্নটি করলেন।

মোরবার্গ জানালেন, আর্ডবোর ঠিকানা জানা নেই এমন কথাতো বলি নি।

সভা আশ্চর্য হয়ে শুনে গেল।

শঙ্করানন্দ জানালেন, এসব প্রশ্ন ওদের কেন করছেন ? এসব ব্যাপার আমরা নিজেরা আলোচনা করে নিতে পারি।

যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্ত কিভাবে চলেছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সব একের পর এক তথ্য থেকে তা জানা যায়। বোঝা যায়, সত্য চাপা দেওয়ার জন্য দিল্লীতে ক্ষমতাশীল দল এখন কী মরিয়া। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উইন চাড্ডাকে দিল্লীতে উড়িয়ে নিয়ে আসা, ১৫ এপ্রিল তার সাক্ষ্য আদায় করা ইত্যাদি যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটানো হলো—তার পরেও কী সংসদীয় তদন্ত কমিটির মতিগতি বুঝতে অসুবিধে বা কষ্ট হয় ?

সুতরাং তদন্ত কমিটির যা রায় বেরুবে তা কি ঠক্কর-নটরাজন কমিশনের রায় থেকে আলাদা কিছু হবে ?

যে সব অর্থনৈতিক অপরাধে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা যুক্ত থাকেন বলে অভিযোগ ওঠে সে সবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিশনের রায় প্রহসন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও এখন এটি অজ্ঞাত থাকছে না।
